ভাই আবু আব্দুল্লাহ আল-মায়াফিরী

অনুবাদ
আল হিকমাহ অনুবাদ টিম

‘জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ’ সম্পর্কে প্রচলিত আপত্তির জবাব

মূল

ভাই আবু আব্দুল্লাহ আল-মায়াফিরী

অনুবাদ

আল হিকমাহ অনুবাদ টিম

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

চলমান সময়ের বাস্তবতা বোঝার জন্য এবং প্রবহমান ঘটনাসমূহকে বাস্তব চিত্রসহ সত্যনিষ্ঠ ও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করার জন্য মুসলিম উম্মাহ একটি সত্য-নির্ভর বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম সন্ধান করে আসছে। বর্তমানে তথাকথিত বৈশ্বিক সংবাদ মাধ্যমগুলো সর্বক্ষেত্রেই তাগুত-গোষ্ঠী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর গোলামী করে চলছে। তাই এই অঙ্গনটি মিথ্যাচার, অপবাদ ও অসত্যে ডুবে আছে। তারা যে কোন একটি কালো ঘটনাকে মুহূর্তেই সাদা বলে প্রকাশ করতে এবং একটি ঘটনা-চিত্রকে বাস্তবতার পরিপূর্ণ বিপরীতভাবে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না ।

তাই মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত - যে কোন সংবাদ-সূত্র গভীরভাবে যাচাই করে গ্রহণ করা এবং তাগুতগোষ্ঠীকে মুসলিম উম্মাহর চিন্তা চেতনায় আঘাত করে তাদেরকে অপদস্থ-পরাজিত করার সুযোগ না দেয়া। মুসলিমদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোন ঘটনাকে বিকৃত-মূল্যায়নের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নিকৃষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার সুযোগ কোন কাফেরকে দেয়া যাবে না।

আমাদের কর্তব্যের আরেকটি অংশ হচ্ছে: যে কোন ঘটনার বাস্তব চিত্রে পৌছার জন্য সত্য তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংশয়গুলোকে নিপুণভাবে নিরসন করা। এভাবে করলেই বাতিল অবদমিত হবে, সংশয় নিরসন হবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, মাজলুমের সহায়তা হবে এবং ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের ধূম্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

৯/১১ এর ঘটনাটি খুব গভীর ও শক্তভাবে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছে। এরপর থেকেই জিহাদি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের ভয়াবহতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই ঘটনার পর থেকেই ইসলামের প্রতিনিধি কায়েদাতুল জিহাদ ও কুফরের কালো-হাত আমেরিকার মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলস্বরূপ আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতির সাথে বিদ্বেষী ক্রুসেডার খৃষ্টানদের যুদ্ধ চলছে। ক্রুসেডাররা এই যুদ্ধের শুরু থেকেই কোন সংগঠন বা দলকে কেন্দ্র করে নয়, বরং সরাসরি ইসলামকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আসছে।

এই নব্য বৈশ্বিক ক্রুসেড যুদ্ধে তানজীমুল কায়েদা বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার ও চক্রান্তের শিকার হয়েছে। তাগুত-বিশ্ব আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণকে

প্রতিহত করতে সব ধরনের চেষ্টা-কৌশল অবলম্বন করে আসছিলো। ৯/১১ এর পর তানজীমুল কায়েদার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তাদের নোংরা কূটকৌশলের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এই ক্রুসেড যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাদের দোসর - মুসলিম দেশগুলোর তাগুত শাসকগোষ্ঠীও যুক্ত হয়। এই তাগুত অনুচররা মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোকে সর্বদিক থেকে চরমভাবে কোণঠাসা করে আসছে। মুসলিমদের বাস্তুচ্যুত করে, তাদের প্রতি স্বৈরাচারী আচরণ করে এবং প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে নিষ্পেষণ করে এই তাগুতেরা পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তবে মুসলিম উম্মাহ সবসময় এমন একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরাপত্তায় সুসজ্জিত প্রভাতের স্বপ্ন দেখে আসছে, যেখানে থাকবে না কোন অনাচার, থাকবে না কোন মিথ্যাচার।

মুসলিম উম্মাহকে আবার ঘুরে দাড়াতে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে। কারণ তাগুতগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের জাল চারপাশে বিস্তার করে রেখেছে। মুসলিমদেরকে তারা নিজ ভূমি থেকে প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ করে চলছে। মুসলিম-সন্তানদেরকে সম্মুখ যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে তুচ্ছ দুনিয়াবি বিষয়সমূহে ব্যস্ত করে রাখছে। এমনকি এই যুবকরা এখন একজন একত্ববাদী মুসলিম হিসেবে দ্বীনের যতটুকু দায়িত্ব নেয়া দরকার, ততটুকু নিতেও অক্ষম।

“বাইতুল মাকদিস” আপনাদের সামনে আবু আব্দুল্লাহ আল মায়াফিরী'র এই নতুন গ্রন্থটি পেশ করছে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে - সাংবাদিকতার অঙ্গনটিকে অপবাদ-অপপ্রচার ও মিথ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং নিরেট সত্য ও সঠিক চিত্র প্রকাশের মাধ্যমে শত্রুর চক্রান্ত মূলেই ধ্বংস করে দেয়া। যাতে বিশ্ববাসী কোন অতিরঞ্জন ও স্বার্থ-ঘেঁষা বিশ্লেষণ ছাড়াই এই যুদ্ধের আসল সত্য জানতে পারে।

আবু আব্দুল্লাহ আল মায়াফিরী এই গ্রন্থে তানজীমুল কায়েদাকে কেন্দ্র করে চলমান বিভিন্ন সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। মুসলিম জাতির ইতিহাস পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করা এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য উদাহরণ রেখেছেন, যা মূলত প্রত্যেক গবেষকেরই দায়িত্ব। লেখকের দৃঢ়-হস্ত লিখনির সঙ্গে আমরা পাঠকের একটি উপভোগ্য পাঠের আশা করি। সুদৃঢ় হিম্মত সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিকে আমরা আহবান করছি - আপনারা প্রজ্ঞা ও হিকমতের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসকে ভুল ও মিথ্যা তথ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করুন। যাতে

আগত প্রজন্মের জন্য আমরা একটি স্বচ্ছ, পরিপাটি ও অনুসরণযোগ্য ইতিহাস রেখে যেতে পারি, যা উম্মাহর মাঝে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ও আখলাকে নবীর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকবে।

– প্রকাশক, বাইতুল মাকদিস

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد و آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

তানজিম আল-কায়েদা সম্পর্কে অবান্তর কিছু প্রশ্নের অবতারণা করে অনেকে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিভ্রান্তির ধুম্রজাল ছিন্ন করতে সেসব প্রশ্নের বাস্তবসম্মত উত্তর জানা আবশ্যক। তাই ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে এসব প্রশ্ন সংগ্রহ করেছি, তারপর আমার সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবশ্য আল-কায়েদার কর্মপন্থা ও নীতিমালার সবই আমার জানা, এমনটি দাবি করা ঠিক হবে না। সুতরাং যা কিছু সত্য ও সুন্দর, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর অসত্য কিছু থেকে থাকলে তা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

সেসব প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো (১৪টি) :

১) সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙ্গতে আমেরিকা নিজে আল-কায়েদা সৃষ্টি করেছিল, আর এখন আরব বিশ্বের খনিজসম্পদ লুণ্ঠন করতে আল-কায়েদাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। এর সত্যতা কতটুকু?

২) শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর আল-কায়েদার আদর্শগত পরিবর্তন হয়েছে?

৩) আল-কায়েদা কি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে?

৪) বিশ্বের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা আল-কায়েদার মুষ্টিমেয় মুজাহিদ শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে টিকে থাকতে পারবে কী?

৫) তানজিম আল-কায়েদার কর্মপন্থা কী?

৬) তানজিম আল-কায়েদার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?

৭) তানজিম আল-কায়েদা সেনা সদস্যদেরকে হত্যা করে কেন?

৮) তানজিম আল-কায়েদা ও আইএস-এর মাঝে কোনও পার্থক্য আছে কি? যদি থাকে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য কী কী?

৯) ক্ষমতাচ্যুত ইয়েমেনী প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ্ সালেহের সাথে আল-কায়েদার কোনও সম্পর্ক আছে কি?

১০) হুথি বিদ্রোহীদের সাথে আল-কায়েদা যুদ্ধ করছে কি? তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আল-কায়েদার কোনও ফ্রন্ট রয়েছে কি?

১১) অপরাপর ইসলামি জামাআত ও আল-কায়েদা বিরোধী শাইখদের ব্যাপারে তানজিমের অবস্থান কী?

১২) আল-কায়েদায় যোগদানের পর যদি কেউ তানজিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহলে তাকে কি হত্যা করা হয়?

১৩) আল-কায়েদা কি তানজিমের যুবকদের ইসতিশহাদী হামলা করতে বাধ্য করে?

১৪) তাইজ শহরে (ইয়েমেন) গুপ্তহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে মূলহোতা কারা? এসবের সাথে আল-কায়েদার কোনও সম্পর্ক আছে কি?

- লেখক

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য স্বয়ং আমেরিকা আল-কায়েদা সৃষ্টি করেছে এবং এখন তারা একে আরব বিশ্বের খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। উক্ত গুজবের কোনও ভিত্তি আছে কি?

উত্তর:

"চিরশত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটাতে আমেরিকা নিজে আল-কায়েদার জন্ম দিয়েছে।" কথাটি যেমন একটি গুজব তেমনি অযৌক্তিক। আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন চেয়েছিল - তা সত্য। তবে এ মর্মে তারা মুজাহিদগণকে সরাসরি কোনও সহযোগিতা করেনি। তারা না দেখার ভান করেছিল। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, তাদের অবস্থান মুজাহিদগণের অনুকূলে ছিল, প্রতিকূলে ছিল না। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আমেরিকার পক্ষ থেকে সরাসরি সহযোগিতার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, জিহাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়াতে এসব গুজব রটানো হচ্ছে। সরাসরি শুনতে সার্চ করুন- http://youtube.com/watch?v=SBULjuOJeW4

যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় যে, আল-কায়েদা আমেরিকার সৃষ্টি - তাহলেও তাতে কী আসে-যায়? এখনতো আল-কায়েদা আমেরিকার প্রধান শত্রু এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে তারা আল-কায়েদাকে খতম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই উত্তর কেবল ওই বিবেকবানদের জন্য, যে নিরপেক্ষতার সাথে সত্যের সন্ধান চায়। নয়তো এসব অভিযোগের সাথে বাস্তবতার দূরতম সম্পর্কও নেই। তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে আমেরিকা কী পরিমাণ ডলার ব্যয় করেছে, যারা তার কিছুটা খবর রাখেন তাদের প্রতি আমার কয়েকটি প্রশ্ন-

আল-কায়েদা ও মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমেরিকা নিজের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, হাজার হাজার সৈনিক হারিয়েছে, বিশ্ব দরবারে তার ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং একক মোড়লগিরীর ইতি ঘটেছে। সুতরাং এটা কিভাবে বোধগম্য হয় যে, আমেরিকা যাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই সে তার সর্বস্ব হারাতে বসেছে? তারা কি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙ্গতে অন্য কোনও অজুহাত বের করতে পারত না? যেমনটি ইরাকের ক্ষেত্রে করেছে? ইরাকের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের জুজু দেখিয়ে তারা কি নিজেদের জাতি ও

বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করেনি? ইরাকের সেই ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সন্ধান কি তারা আদৌ পেয়েছে?

আমেরিকার সামনে এসকল ধ্বংসাত্মক অবস্থার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ কি খোলা ছিল না? অথচ আমেরিকা ইচ্ছা করলে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচাতে পারে। আমেরিকার হাতে এই তল্পিবাহক শাসকরা দাবার গুটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে আল-কায়েদা গঠনের বিষয়টি ছিল কেবল শাইখ উসামার একটি কল্পনা। তিনি মুজাহিদগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন এবং উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি ইসলামি সেনাবাহিনী গঠন করতে চাচ্ছিলেন। যাতে প্রয়োজন হলে বিশ্বের যে কোন জায়গায় অপারেশন চালাতে পারেন।

কমিউনিস্টদের সাথে সম্মিলিত মুজাহিদ বাহিনীর বিজয়লাভের পর শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ সুদানে চলে যান। তার সাথীদের আরেকটি অংশ মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরীক হতে সোমালিয়ায় পাড়ি জমান। এক পর্যায়ে শাইখ উসামা সুদান ছেড়ে আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। এর পূর্বেই তালেবান আফগানিস্তানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেন এবং যুবকরা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন।

এসময় তিনি "আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া আল আলামীয়্যা লী কিতালিল ইয়াহুদ ওয়াস্ সলিবিয়্যিন" নামে একটি ফ্রন্ট খোলার ঘোষণা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আল-কায়েদা, জামায়াতুল জিহাদ ও বাংলাদেশের একটি দল নিয়ে উক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয়। এটি সে সময়কার কথা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়ে গেছে এবং আমেরিকা নতুন পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তখন থেকেই মার্কিনীদের উপর ও আমেরিকান স্বার্থের উপর হামলার সূত্রপাত হয়। হামলা হয় নাইরোবি, দারুসসালাম ও এডেনে।

৯/১১-এর হামলার পূর্বে ড. আইমান আয যাওয়াহিরীর নেতৃত্বে জামায়াতুল জিহাদ পুরোপুরিভাবে আল-কায়েদায় যোগদান করে। আমির ও নায়েবে আমির নির্বাচিত হন যথাক্রমে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এবং ড. আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ। এ পর্যায়ে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার নাক গলানো বন্ধ করতে এবং তাদেরকে ধীরে ধীরে দুর্বল ও নিঃশেষ করতে - আমেরিকাকে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের

ময়দানে টেনে আনতে গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা হাতে নেন। আর এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয় ৯/১১-এর হামলার মাধ্যমে।

২) শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ নিহত হওয়ার পর আল-কায়েদা কি বদলে গেছে?

এই প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হচ্ছে, যারা এই প্রশ্ন তুলছে তারা জানে যে, আল-কায়েদা কেবল আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু তারা এখন দেখছে যে, আল-কায়েদা আমেরিকার স্থানীয় তাবেদারদের সাথেও লড়তে শুরু করেছে।

আসলে আল-কায়েদা তার মূলনীতি থেকে এক বিন্দুও সরেনি। পূর্বের মতো এখনো আল-কায়েদা আমেরিকার সাথে লড়াইকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ আল-কায়েদা জানে যে, আমেরিকা যদি তাবেদারদেরকে সহায়তা দিয়ে যায় তাহলে এই তাবেদারদের সাথে লড়াই করা বৃথা। এ জন্যই আল-কায়েদা আমেরিকাকে ময়দানে টেনে এনেছে।

যখন তারা বুঝতে পারল যে, তারা ফাঁদে পড়েছে এবং আল-কায়েদার সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়ালে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে, তখন তারা বিকল্প চিন্তা শুরু করল এবং তাদের আঞ্চলিক দোসরদের আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দিল। ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৮ সালের RAND CORPORATION কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে এর বিস্তারিত তথ্য বিদ্যমান। ইন্টারনেটে তাদের ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ তা দেখে নিতে পারেন। আল কায়েদা নীতিগতভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে একান্ত অনিচ্ছায় এবং আত্মরক্ষার স্বার্থে স্থানীয় তাবেদারদের সাথে যুদ্ধ করছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

পারতপক্ষে আল-কায়েদা স্থানীয় সরকারে সাথে যুদ্ধে জড়ায় না। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা অবৈধ মনে করে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আল-কায়েদার জানা আছে, আমেরিকা যতদিন পর্যন্ত এদের পেছন থেকে শক্তি যোগাবে ততদিন এদেরকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। সুতরাং সাময়িকভাবে তাদের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর অর্থ এই নয় যে, আল-কায়েদা তার মূলনীতি থেকে সরে এসেছে।

উল্লেখ্য, এসব তাবেদার সরকারকে আল-কায়েদা অবৈধ মনে করে এবং অস্ত্রের মাধ্যমে হলেও এদের পতন ঘটানো আবশ্যক মনে করে।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে এই পর্যায়ে শাইখ উসামার বক্তব্যের কিছু চুম্বকাংশ তুলে ধরছি। অ্যাবোটাবাদ নথিতে শাইখ উসামার পক্ষ থেকে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিব্বীকে পাঠানো কিছু চিঠি পাওয়া গেছে। সে চিঠিগুলোর ৩য় পর্বে এসেছে, শাইখ বলেন, "আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে জেনে থাকবেন যে, তিউনিসিয়ার স্বৈরশাসকের পতনের দশদিনের মাথায় মিশরের বিপ্লব শুরু হয়। আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির প্রধান মিত্র ও মিশরের দুর্বিনীত একনায়কের পতন ঘটাতে শুধু কায়রোতেই সমবেত হয় চার মিলিয়নেরও অধিক মানুষ। তার পতনের পূর্বেই এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে ইয়েমেন এবং লিবিয়ায়। গাদ্দাফী সরকার বিপ্লব থামাতে রীতিমতো পাগল হয়ে গেছে। আশাকরি, বিপ্লবের এই ধারা অচিরেই মুসলিমদের অনুকূলে চলে আসবে।"

'ইলা ইখওয়ানিনা ফী বাকিস্তান' (পাকিস্তানী ভাইদের প্রতি) শিরোনামে শাইখ উসামার রহিমাহুল্লাহ'র একটি বক্তব্য আস-সাহাব মিডিয়া থেকে প্রচারিত হয়। শাইখ সেখানে বলেন, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মার্কিন সেনাবাহিনী একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব।

যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকে 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই' বলে অভিযোগ তুলে, শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু উক্ত অভিযোগের মাধ্যমে তারা মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে।

'আরব বসন্ত' চলাকালে ১৬ জুমাদাল উখরা, ১৪৩২ হিজরি মোতাবেক ১৯শে মে ২০১১ ইং তারিখে মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে এক বার্তায় শাইখ বলেন, "হে উম্মাহর সন্তানরা! তোমাদের সামনে রয়েছে কণ্টকাকীর্ণ পথ। সেই সাথে রয়েছে স্বৈরশাসকদের প্রবৃত্তি পূজা, মানবরচিত আইনের বাধ্যবাধকতা ও পাশ্চাত্যরীতি থেকে মুক্তির সুবর্ণ সুযোগ।"

'রিসালাতুন ইলা ইখওয়ানিনাল মুসলিমীন ফিল ইরাক' (ইরাকী মুসলিম ভাইদের প্রতি বার্তা) শিরোনামে অপর এক বার্তায় শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমেরিকা এবং যারা তাদের সাথে জোট বেঁধে মুসলিমদেরকে হত্যা করছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। এটা সবারই জানা আছে। তবে কখন লড়াই করতে হবে, সে বিষয়ে কিছুটা মতভিন্নতা রয়েছে।"

উক্ত বার্তায় তিনি আরও বলেন, “একের পর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকার এই উত্তপ্ত যুগসন্ধিক্ষণে প্রত্যেক সত্যিকার মুমিনের কর্তব্য হলো, আমেরিকার গোলামদের গোলামি থেকে মুক্তি পেতে এবং দুনিয়ার বুকে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে উম্মাহকে উৎসাহিত করা। পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে জর্ডান, মরক্কো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, মক্কা, মদিনা ও ইয়েমেন হতে পারে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও উর্বর ভূমি।”

মোটকথা আল-কায়েদা-এর নেতৃবর্গ ও সদস্যবৃন্দ একই নীতি ও চেতনার ধারক-বাহক। অনৈক্য থেকে বাঁচতে এবং ঐক্য অটুট রাখতে এর বিকল্প নেই।

৩) আল-কায়েদা কি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে?

আল-কায়েদা শুরার নীতিতে বিশ্বাসী[১]। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকে তারা শরিয়ত-বিরোধী[২] মনে করে।

খেলাফত ঘোষণার পূর্বে যে কাজগুলো করা আবশ্যক ছিল তা হলো, উম্মাহর ঘাড়ে চেপে বসা শত্রুদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং উম্মাহকে শত্রুদের প্রভাব-বলয় থেকে বের করে আনা। যাতে তারা শত্রুভীতি ও তাদের প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের শাসক নির্বাচন করতে পারে।

সন্দেহ নেই, ইসলামের শত্রুরা বিশেষত আমেরিকা পারতপক্ষে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হতে দিবে না, সম্ভাব্য সব উপায়ে তারা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। যেমনটি করেছে IS এর ক্ষেত্রে এবং মুহাম্মদ মুরসির নেতৃত্বাধীন ইখওয়ানের ক্ষেত্রে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আপনি দাবি করছেন চলমান ধাপে আল-কায়েদা ইসলামি

---

[1] আই.এস খেলাফত ঘোষণা করেছিল ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’র পরামর্শ ছাড়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আল-কায়েদা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে।

[2] আমার উদ্দেশ্য মোটেও এই নয় যে, মানবরচিত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী স্বৈরশাসকদের পতনের জন্য বলপ্রয়োগ করা যাবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ শ্রেণীর রাষ্ট্রপ্রধানদের পতনের পর শাসক নির্বাচিত হতে হবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের পরামর্শ মাফিক।

ইমারতহ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে না, তাহলে আবিয়ান ও মুকাল্লা (ইয়েমেনী শহর) দখল করেছিল কেন?

আল-কায়েদা এসকল অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ঠিক। তবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চেপে বসার এবং তাদের অনিচ্ছায় তাদের শাসক বনে যাওয়ার ইচ্ছা আল-কায়েদার আদৌ ছিল না। আল-কায়েদা কেবল শূন্যতার সুযোগ নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সঠিক দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, সাধারণের স্বার্থ রক্ষার প্রতি ইসলামের অবস্থান জানতে মানুষকে সুযোগ দেওয়া, শরিয়তের আদল ও ইনসাফের নমুনা মানুষের সামনে পেশ করা। আল-কায়েদার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। ফলে, তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহে নাগরিক সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার মান ইয়েমেনের অন্য যেকোনো অঞ্চল থেকে ভালো।

৪) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আল-কায়েদার হাতেগোনা জিহাদি দলসমূহ শত্রুদের চতুর্মুখী আক্রমণ প্রতিহত করে টিকে থাকতে পারবে কি?

গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকলে এই প্রশ্নের উত্তর বুঝা সহজ। সম্মুখসমরে গতানুগতিক পন্থায় শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করা কঠিন হলে, দুর্বল পক্ষ এই যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। একের পর এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে শত্রুকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল করতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতাকামীরা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করছে এবং এটি ভালো কাজ দিচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়েছেন। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তাই বলা চলে, সুপরিকল্পিত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিশালী বড় কোনও সেনাবাহিনীকেও চরম ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি করা এমনকি পরাজিত করাও সম্ভব। আল-কায়েদা আমেরিকার বিরুদ্ধে এটিই করছে। তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের সেনাবাহিনীর চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তাদের অর্থব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গেছে। ক্রমান্বয়ে তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। এভাবে আল-কায়েদা যদি তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে তাহলে একসময় আমেরিকাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

৫) তানজিম আল-কায়েদার মানহাজ কি?

আকিদাগতভাবে তানজিম আল-কায়েদা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'-এর অনুসারী। তাওহীদ, গায়েব, তাকদির, ঈমান ও কুফরসহ মৌলিক সকল ক্ষেত্রে তারা আহলুস সুন্নাহর আকিদায় বিশ্বাসী। যারা একদিকে নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী দাবী করে কিন্তু ঈমান ও কুফরের হাকিকত নিয়ে আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করে, আল-কায়েদা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাকথিত আহলুস সুন্নাহর অনুসারীদের মতো মানুষের মতামতকে কোরআন-হাদিসের উপর প্রাধান্য দেয় না, বরং বিরোধপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তিতে কোরআন ও হাদিসের ফয়সালাকে চূড়ান্ত মনে করে।

আল-কায়েদার কর্মপন্থা : আল-কায়েদা দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। একে মোটেও তারা অবজ্ঞার চোখে দেখে না। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে তারা জিহাদ ও কিতালের পথ অবলম্বন করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

অর্থ: "আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের জিম্মাদার নন, আর আপনি মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা"। (সূরা নিসা ৪:৮৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের শক্তি ও প্রতাপ খর্ব করার পদ্ধতি স্বরূপ জিহাদ ও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের ফর্মুলা বাতলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:

»إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ «

ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা ‘ঈনা (নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পুনরায় মূল্য কম দিয়ে ক্রেতার নিকট হতে ঐ বস্তু ফেরত নিয়ে) কেনা-বেচা করবে আর গরুর লেজ ধরে নেবে এবং চাষবাসেই তৃপ্ত থাকবে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করা বর্জন করবে তখন আল্লাহ তোমাদেরকে অবমাননার কবলে ফেলবেন আর তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে এটা অপসারিত করবেন না। (আবু দাঊদ ৩৪৬২, আহমাদ ৮৪১০, ৪৯৮৭, ২৭৫৭৩)

সুতরাং কর্মপদ্ধতির দিক থেকে আল-কায়েদা সেইসব ইসলামি দলের বিপরীত, যারা বর্তমানের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতি থেকে উম্মাহকে উদ্ধার করতে জিহাদের পরিবর্তে দাওয়াতের পথ বেছে নিয়েছে। জিহাদ মানব প্রকৃতিতে প্রোথিত। মানুষ স্বভাবগতভাবে আত্মরক্ষা করে। প্রতিরোধের আসমানি নীতিও তাই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

“অর্থ: আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল”। (সূরা বাকারা ২:২৫১)

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“অর্থ: আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হতো খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনালয়, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ -যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়”। (সূরা হজ্জ ২২:৪০)

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত - নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ(?) ভাবে যারা তাগুতদের থেকে মুক্তির চেষ্টা করে তারা কারাবরণ, টর্চারিং এমনকি হত্যার শিকার হয়েছে।

আরও প্রমাণিত যে, উত্তাপহীন দাওয়াহ কেবল নিষ্ক্রিয়তা, স্থবিরতা ও বশ্যতার মাত্রাই বৃদ্ধি করে।

৬) তানজিম আল-কায়েদার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

তানজিম আল-কায়েদার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, দুনিয়ার বুকে আল্লাহর বিধান কায়েম করা। এ লক্ষ্যে কেবল আল-কায়েদা কাজ করছে, বিষয়টি এমন নয়। বহু ইসলামি দল এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে তানজিম আল-কায়েদা সশস্ত্র পন্থায় লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে। এটিই আল-কায়েদার বৈশিষ্ট্য।

অপরাপর ইসলামি দলসমূহের মতো আল-কায়েদাও মনে করে যে, ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের শাসকগোষ্ঠী উম্মাহর শত্রুদের তাবেদার। তারা উম্মাহকে জিম্মি করে রেখেছে এবং শরিয়ত বহির্ভূত পন্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করছে। এজন্যই অন্যান্য তানজিমসমূহ সম্ভব্য উপায়ে সরকার ও শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা সশস্ত্র না হওয়ায় বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছে। উপরন্তু ইসলামি আন্দোলনের যুবকদের জন্য তা বয়ে এনেছে মহা বিপর্যয়! তাদেরকে দিয়ে জেলখানাগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করা হয়েছে। তাদের কবর গণকবরে পরিণত হয়েছে। পরিবর্তনের লক্ষ্যে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তারা হলো-

ক) সিরিয়ায় ইখওয়ান ও প্রথম দিকের লড়াইকারী দলসমূহ।

খ) আলজেরিয়ায় জাবহাতুল ইনকায ও সমমনা দলসমূহ।

গ) আল জামায়াতুল ইসলামিয়া আল মুকাতিলাহ, লিবিয়া।

ঘ) আল জামায়াতুল ইসলামিয়া, মিশর।

পরবর্তীতে আন্দোলনকারী ইসলামি দলসমূহ ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে সে মতে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে সংঘাত ও লড়াইয়ের নীতিকেই অযথার্থ ভাবতে লাগল। কেউ গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকল, আবার কেউ এমনি অন্য কোনও পন্থা বেছে নিল। শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের পরিবর্তে নিজেরাই আমূল বদলে গেল। তবে জিহাদি তানজিমসমূহের গায়ে এ ধরণের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। সশস্ত্র জিহাদের

নীতিতে তারা পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল। তারা নিজেরা বদলে যাওয়ার বদলে পরাজয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ-

ক) জিহাদ মুষ্টিমেয় মানুষের মাঝে সীমিত ছিল। সরকারের সামর্থ্যের তুলনায় তাদের সামর্থ্য ছিল খুবই নগণ্য।

খ) সরকারের হালচাল ও প্রকৃত অবস্থা সর্বসাধারণ জানত না, তাই তারা আন্দোলনকারীদেরকে সঙ্গ দেয়নি। কেবল মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীকে সরকারের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে সরকার ও তার গোয়েন্দা বাহিনী সহজে আন্দোলনকারীদেরকে সনাক্ত করতে পেরেছে এবং বন্দি বা হত্যা করেছে।

গ) নিজস্ব মিডিয়া না থাকায় ইসলামি আন্দোলনকারীরা নিজেদের বক্তব্য দেশবাসীর কাছে পৌঁছাতে পারেনি। অপরদিকে সরকার মিডিয়া ব্যবহার করে ইসলামি আন্দোলন এবং তার কর্মীদের ব্যাপারে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

এসকল কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে মুজাহিদগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হলো-

উম্মাহকে ব্যাপকভাবে জিহাদে শরীক করা না গেলে বিজয় লাভ সম্ভব হবে না।

স্থানীয় সরকারের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ নয়, তাই তাদের সাথে সংঘাত পরিহার করা হবে। যুদ্ধ হবে এমন শত্রুর (আমেরিকা) বিরুদ্ধে হবে, যার সাথে যুদ্ধের বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম কারণ হলো, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উম্মাহ কখনো ক্লান্তি ও দ্বিধাবোধ করবে না। অন্যদিকে আমেরিকার পতন হলে এমনিতেই এসব স্থানীয় সরকারের পতন ঘটবে। কারণ, তাদের শক্তি-সামর্থ্য, কামনা বাসনা সবই আমেরিকার সাথে জড়ানো।

উক্ত নীতি (**نظرية ضرب رأس الأفعى**) তথা 'সাপের মাথায় আঘাত হানা'র নীতি বলে পরিচিত। জিহাদি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উক্ত নীতি আবিষ্কারের পর আল-কায়েদা গঠিত হয়। উক্ত নীতির আলোকে আল-কায়েদা ২০ বছরের যুদ্ধ-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর সূচনা হয় ২০০০ সাল থেকে। গেরিলা পদ্ধতিতে মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঘাত হানা হবে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় আল-কায়েদা বহু মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু সফল অপারেশন পরিচালনা করে। তার মধ্যে ৯/১১ হামলা ছিল সবচেয়ে বড় ও ফলপ্রসূ।

এই হামলার ইতিবাচক কয়েকটি দিক-

- ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত মানে তাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ডে আঘাত হানা।
- পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউসকে টার্গেট করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে বিশ্ব দরবারে অপদস্থ করা হয়েছে।
- আরও সম্ভাব্য হামলার আশংকায় তারা নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে। এতে তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। সেই সাথে এই হামলার মাধ্যমে তাদেরকে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিশ্ববাসীর মন থেকে তাদের বিষয়ক অজানা ভীতি দূর হয়েছে।

অপরিপক্ক কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে বলতে শোনা যায় যে, ৯/১১ হামলা নাকি আমেরিকা নিজেই করেছে।

বস্তুত নাইন ইলেভেনের হামলার দ্বারা আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল আমেরিকার অর্থনীতিতে আঘাত হানা, তাদের ভয়-ভীতি বিশ্ববাসীর মন থেকে দূর করা, বিশ্বের উপর তাদের একক মোড়লগিরীর অবসান ঘটানো এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে নিঃশেষ করতে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে টেনে আনা।

এটা কি যৌক্তিক যে, নিজের কিছু স্বার্থ হাসিলের জন্য আমেরিকা নিজেই আল-কায়েদার এসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছে? অথচ তারা তেমন কোনও ক্ষতির মুখোমুখি না হয়েও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে পারত। তাছাড়া বিশ্ববাসীর সামনে নিজের রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার মাঝে কী স্বার্থ থাকতে পারে?!

৭) আল-কায়েদা সেনাদের হত্যা করে কেন?

উত্তর : সাধারণভাবে সকল জিহাদি তানজিম বিশ্বাস করে এবং জানে যে, এই সকল রাষ্ট্র ও তাদের সেনাবাহিনী ইসলামি শরিয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং উক্ত কুফরি আইন প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে। আর এটাতো জানা কথা যে, শরিয়তের কোনও একটি বিধানকে অস্বীকারকারীর

সাথে লড়াই করা আবশ্যক। উক্ত কাজের দলিল হল; যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। আর ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ মাজমুউল ফাতাওয়ায় লিখেছেন -

'ইসলামী শরিয়াহ'র কোনও একটি বিধান যদি কেউ অস্বীকার করে তার সাথে লড়াই ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে'।

'ইকামাতুত দলীল আলা ইবতালিত তাহলীল' গ্রন্থে তিনি বলেন,

'যারা শরিয়তের প্রকাশ্য ও স্বতঃসিদ্ধ কোনও বিধান অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। যেমন, নামাজ অস্বীকারকারী, কোরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীকে যাকাতের মাল বণ্টনের বিষয়টি অস্বীকারকারী, রমজানের রোজা অস্বীকারকারী এবং যারা মুসলিমদের রক্ত ঝরায়, মুসলিমদের মালামাল লুণ্ঠন করে অথবা নিজেদের মাঝে কোরআন-সুন্নাহ মাফিক ফায়সালা না করে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং সাহাবায়ে কেরামের ভাষ্যমতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব'।

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ মাজমুউল ফাতাওয়াতে আরও বলেন,

'যারা শরিয়তের প্রকাশ্য কোনও বিধানকে অস্বীকার করে অথবা অপ্রকাশ্য বিধানকে অস্বীকার করে এবং তা নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। যারা বলে, আমরা রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু নামায পড়বো না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা নামায পড়তে সম্মত হয়। যদি বলে আমরা নামায পড়বো তবে যাকাত দেব না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা যাকাত দেয়। যদি বলে আমরা যাকাত দিবো তবে রোজা রাখব না এবং হজ্জ করব না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা রমজানের রোজা রাখে ও হজ্জ করে। যদি বলে আমরা সবই করব তবে সুদী লেনদেন, মদপান ও অশ্লীলতা বর্জন করব না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব না, ইহুদি-নাসারাদের উপর জিযিয়া (কর) আরোপ করব না - তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, যতক্ষণ না তারা এসবের মধ্যে পালনীয়গুলো পালন করে এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো বর্জন করে'।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}

“অর্থঃ তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়”। (সূরা আনফাল ৮:৩৯)

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এর বিভিন্ন ফতোয়া ও রিসালায় এসেছে, যারা ফরজ নামাজসমূহকে আংশিকভাবে অর্থাৎ কোনও এক ওয়াক্ত বা একাধিক ওয়াক্ত নামাযের ফরজিয়ত অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। তেমনি যারা রোজা ও হজ্জ ফরজ হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে, অথবা মুসলমানের জান-মালের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত না থাকে, মদ, জিনা, জুয়া ও মাহরামকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ হওয়া, ইহুদি-নাসারাদের উপর জিযিয়া (কর) আরোপসহ শরিয়তের অবশ্যপালনীয় বা বর্জনীয় বিধানসমূহকে আংশিকভাবে হলেও অস্বীকার করে বা স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও পালন করা থেকে বিরত থাকে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনও দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

এতো গেল কিতালের বিষয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে সামর্থ্য থাকলে কিতাল করতে হবে, অন্যথায় ই’দাদ তথা কিতালের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তবে ব্যক্তি-বিশেষকে তাকফির করতে হলে আহলে সুন্নাহ কর্তৃক প্রণীত তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ মাথায় রাখতে হবে। কারণ, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাসহ তাকফিরের আরও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে।

এসব রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী শুধু স্বৈরাচারী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই (ইসলাম বিরোধী) নয়, বরং এরা উম্মাহর শত্রুদের পক্ষে এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং তাদের ধন-সম্পদ শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছে। বাস্তবতা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ অথবা যারা শত্রুদের ভাড়াটে কর্মী তারা ছাড়া কেউই এ সকল সরকারকে বৈধ মনে করে না এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই আবশ্যক হওয়া অস্বীকার করে না। তবুও আল-কায়েদা এসব সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, কারণ তাঁরা বড় শত্রুর (আমেরিকা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে প্রাধান্য দেয়।

পেছন থেকে সহায়তা প্রদানকারী পক্ষ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন এসব সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করা, নিজেদের শক্তি ক্ষয় ও একই বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আল-কায়েদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, লড়াই হবে পেছনের শত্রু আমেরিকার সাথে। জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া এর ব্যতিক্রম হবে না। যেমন সরকার যদি স্বপ্রনোদিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করে তাহলে আল-কায়েদা তাদেরকে প্রতিরোধ করবে এবং ততটুকু শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে যাতে তারা পুনরায় হামলা করার সাহস না পায়। তাইতো দেখা যায় ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ যখন আমেরিকার হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে তখন আল-কায়েদা সরকারি বাহিনীর উপর পাল্টা হামলা করেছে। তবে এ ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা ছিল। হাদী সরকারের সাথেও এ নীতির পরিবর্তন হয়নি। হাদীর ক্ষমতা গ্রহণের পর বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর অনুগত বাহিনীগুলোর উপর আল-কায়েদা হামলা পরিচালনা করছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীর অনুগত কিছু বাহিনী আল-কায়েদার সাথে যুদ্ধে জড়াতে আগ্রহী নয়, তাই মুজাহিদগণ তাদেরকে টার্গেট করছে না। কারণ আল-কায়েদা বড় শত্রু আমেরিকার সাথে বোঝাপড়া করতে এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ব্যস্ত। আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সাথে তারা যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আমেরিকার রণকৌশল পরিবর্তন :

আমেরিকা যখন বুঝতে পারল যে, আল-কায়েদা ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তিক্ষরণের পথে এগুচ্ছে এবং তাদেরকে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে, তখন তারা নিজেদের কৌশল পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে শুরু করল। মার্কিন সেনাদেরকে লড়াইয়ে নামানোর বিকল্প খুঁজতে লাগল। সে মতে, র‍্যান্ড কর্পোরেশন (RAND Corporation) তার গবেষণাপত্র মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। সেখানে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে লড়তে স্থানীয় শত্রু সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাছাই করা সুন্নি সম্প্রদায়, শিয়া ও মডারেট মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেখানে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, এরাই আল-কায়েদাকে নির্মূল করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের প্রতিবেদনসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি হলো- Building Moderate Muslim Networks (মডারেট মুসলিম নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা)। এই প্রতিবেদন ইন্টারনেটে বিদ্যমান।

মার্কিন সাহায্যের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ পেয়েছে শিয়া-সম্প্রদায়। কারণ, আল-কায়েদা এবং সালাফিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমেরিকা তাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছে। সালাফি-বিরোধী অবস্থান তারা এজন্য গ্রহণ করেছে যে, তারা মনে করে সালাফিগণ আল-কায়েদা ও সন্ত্রাসের উৎপত্তিস্থল।

যাইহোক, এই পরিকল্পনা মোতাবেক তারা গোষ্ঠীগত যুদ্ধ উস্কে দেয়। মার্কিন সাহায্য ও আধুনিক অস্ত্রের চালান পেয়ে শিয়ারা পরিণত হয় শক্তিশালী পক্ষে, আর আহলুস সুন্নাহ হয়ে যায় দুর্বল পক্ষ। যারা শিয়া-সুন্নি যুদ্ধের খবরাখবর রাখেন, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, তৃতীয় একটি পক্ষ সবসময়ই এই যুদ্ধ দীর্ঘ করতে চায়। শিয়ারা যখনই ফাঁদে আটকা পড়ে বা নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে যেতে থাকে তখন সেই তৃতীয় পক্ষ সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। ইয়েমেনে বিশেষ করে 'তাইজে' এমনটি খুব বেশি দেখা যায়।

৪) আল-কায়েদা ও আইএস-এর মাঝে কোনও পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেগুলো কি?

উত্তর : আল-কায়েদা ও আইএসের মাঝে রয়েছে বিশাল পার্থক্য। এ বিষয়টি তিনটি পর্যালোচনা ও একটি পরিশিষ্টে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পর্যালোচনা

আইএস সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ইরাকে আল-কায়েদার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে শাইখ আবু মুসআব যারকাভী রহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে। এর নাম রাখা হয়েছিল 'কায়েদাতুল জিহাদ ফি বিলাদির রাফিদাইন।' আরও কিছু দল ও উপদলের মিশ্রণের পর এর নামকরণ করা হয় 'মাজলিসু শুরা আল-মুজাহিদিন।'

এই মজলিস গঠনের মাধ্যমে শাইখ যারকাভী রহিমাহুল্লাহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাতে সফলও হয়েছেন। তবে তার শাহাদাতের পর যখন আবু উমর বাগদাদীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় তখন তিনি 'দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়া'র ঘোষণা দেন, যা ছিল চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এমন পরিস্থিতিতে সি.আই.এ-এর প্রধান পেট্রাউস মুজাহিদদের স্বপ্নের ইসলামী রাষ্ট্র ও তাদেরকে নিঃশেষ করতে এক অভিনব পরিকল্পনা হাতে নেয়।

তার এই নীলনকশার ভিত্তি ছিল; সুন্নিদের মধ্য থেকে একটি সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি করতে হবে, যারা সুন্নি এলাকাগুলো থেকে জিহাদের উপস্থিতি ধ্বংস করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে। পেট্রাউস যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটিই হয়েছে। সুন্নি এলাকাসমূহ মুজাহিদশূন্য হয়ে পড়ল। মুজাহিদগণ আম্বারের মরু অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন এবং সেখানেই থাকতে লাগলেন। রাফেজি প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত সুন্নিদের বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বে তারা আর ফিরে আসেনি।

বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর মুজাহিদগণ আম্বারে ফিরে আসেন এবং বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য করতে থাকেন। সে সময়টিতে নুরি'র সৈনিকরা বিদ্রোহীদের অবস্থানসমূহে হামলা করছিল এবং তাদের শিবিরগুলো জালিয়ে দিচ্ছিল। দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ আম্বারে ফিরে আসার সময়টিতে সিরিয়ায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে সরকারি বাহিনী দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়ার আমীর আবু উমর বাগদাদী এবং যুদ্ধমন্ত্রী আবু হামজা মুহাজির-এর অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। তাই বড় ধরনের হামলা চালিয়ে সরকার তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের স্ত্রীদেরকে বন্দি করে। আবু উমর বাগদাদী নিহত হওয়ার পর আবু বকর বাগদাদীকে তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করা হয়। আল-কায়েদা আবু বকর বাগদাদীকে চিনতেন না। তাই এই নির্বাচনে তারা সায় দেয়নি। আল-কায়েদা তার অপসারণ দাবি করে। কিন্তু ইরাকী নেতৃবৃন্দ এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করে যে, তারা বিষয়টি ঘোষণা করে দেওয়ার পর তা আর প্রত্যাহার করতে পারবেন না। অগত্যা আল-কায়েদা বাগদাদীর ভালোমন্দ জানতে তার জীবন-চরিত পাঠানোর অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা তা করেনি।

সিরিয়ার বিদ্রোহের সূচনাকালে বাগদাদী শামবাসীকে সাহায্য করতে আবু মুহাম্মদ জাওলানীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এর নাম দেওয়া হয় 'জাবহাতুন নুসরাহ লী আহলিশ-শাম'। এ পর্যায়ে জাবহাতুন নুসরাহ ও বাগদাদীর দলের মাঝে চুক্তি হয় যে, জাবহাতুন নুসরাকে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়ার অনুগত বাহিনী হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। এর মাধ্যমে হয়তো দাওলাতুল ইরাক আল-

ইসলামিয়ার অন্যান্য ঘোষণার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং পশ্চিমা লেখকদের টার্গেট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

আবু মুহাম্মদ জাওলানীর নেতৃত্বে জাবহাতুন নুসরাহ যখন বিশাল সফলতা অর্জন করল তখন বাগদাদী তাদেরকে নিজের অনুগত বলে ঘোষণা করলেন এবং দাওলা ও জাবহাতুন নুসরাহর সমন্বিত নাম রাখেন- 'দাওলাতুল ইসলামিয়া ফিল ইরাক ওয়াশ-শাম (আইএস)। জাওলানী হাফিযাহুল্লাহ উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন এবং আল-কায়েদার প্রতি তার আনুগত্যের বিষয়টি পুনঃর্ব্যক্ত করেন।

শাইখ জাওলানী ও বাগদাদীর মাঝে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন তারা উভয়ে শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরীকে শালিস হিসেবে মেনে নেন। যারা এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করছিলেন তারা শাইখ জাওলানী ও বাগদাদীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন যে, সিদ্ধান্ত যাই আসুক তারা মেনে নেবেন। অতঃপর শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী বাগদাদীকে ইরাকে ফিরে যেতে এবং শাইখ জাওলানীকে শামে অবস্থানের নির্দেশ দেন। তখন বাগদাদী তার শপথ ভঙ্গ করেন এবং শাইখ যাওয়াহিরীকে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এ পর্যায়ে এসে তিনি খিলাফাহ ঘোষণা করেন এবং শাইখ জাওলানী, শাইখ যাওয়াহিরী এবং সকল জিহাদি দল ও উপদলসমূহকে তার আনুগত্য করার এবং তাকে বাইআত দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এখানেই থেমে থাকেননি, শাইখ জাওলানীকে[৩] তার কথিত খেলাফতের অনুগত বানাতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তার এই যুদ্ধ অন্যান্য জিহাদি দলসমূহের বিরুদ্ধেও সম্প্রসারিত হয়। তারপর আসে তাকফিরের পালা (কাফের ঘোষণা)। তিনি এবং তার দল মিলে সবগুলো দলকে একেরপর এক কাফের আখ্যা দিয়ে (তাকফির করে) তবেই ক্ষান্ত হয়।

প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে তারাই প্রথমে যুদ্ধ শুরু করত, তারপর তারা সেই দলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে তাকফির করত। ইরাকে তারা যে নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে সিরিয়াতেও তারা তা প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। অথচ ইরাক

---

[৩] পরবর্তীতে শাইখ জাওলানিও আল-কায়েদার সাথে প্রতারণা করে আল-কায়েদা থেকে বের হয়ে যান। এমনকি আল-কায়েদাকে সিরিয়াতে কাজ করতেও বাঁধা প্রদান করেন। এই ব্যাপারে শাইখ সামী আল উরাইদি হাফিযাহুল্লাহ লিখিত 'আল-কায়েদা'র সঙ্গে "জাবহাতুন নুসরাহ" (জাবহাতু ফাতহিশ-শাম) এর সম্পর্কচ্ছেদ বিষয়ে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ' বইটি পড়লে প্রকৃত বিষয়টি সম্পর্কে পাঠক জানতে পারবেন। লিংক- http://gazwah.net/?p=৩১৮৫৬ - অনুবাদক

ও সিরিয়ার অবস্থা মোটেও এক ছিল না। কারণ ইরাকের সাহাওয়াত (দল) আমেরিকার পক্ষ হয়ে মুজাহিদগণকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করছিল। আমেরিকার পক্ষাবলম্বী সাহাওয়াতের বিরুদ্ধে আইএস সফলতা পেয়েছে। অপরদিকে সিরিয়ার মুজাহিদগণ যুদ্ধ করছিলেন আত্মরক্ষার খাতিরে এবং তারা যুদ্ধ করছিলেন আইএসের আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষ্যে।

তারা শুধু নির্বিচারে তাকফির করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং বিদ্রোহী বহু দল ও গোত্রের বিরুদ্ধে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। নারী ও শিশুদের সামনে তারা শুয়াইত্বাত গোত্রের পুরুষদের হত্যা করেছে। জিহাদি ও বিদ্রোহী বহু নেতৃবৃন্দকে তারা শিরশ্ছেদ করেছে। তাঁদেরকে হত্যা করতে তারা বিভিন্ন ফাঁদ পেতেছে, আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে। তাদের হামলার হাত থেকে আল্লাহর ঘর মসজিদও রক্ষা পায়নি। আহরারুশ-শামের কতিপয় মুজাহিদ এক মসজিদে তারাবিহ পড়ছিলেন, বাগদাদীর সেনারা তাদেরকে নামাজরত অবস্থায়ই হত্যা করে।

এই পর্যায়ে এসে আল-কায়েদা নীরবতা ভাঙ্গতে বাধ্য হয়, তারা আইএসের সাথে আল-কায়েদার বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করেন। তারা জানিয়ে দেন যে, হত্যা, জবাই ও তাকফির করার যে নীতি আইএস গ্রহণ করেছে তা আল-কায়েদার নীতি নয়। তারা এগুলো সমর্থন করে না।

দ্বিতীয় পর্যালোচনা :

ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো দুইভাবে জিহাদের মোকাবেলা করে-

১. শিথিলতা প্রদর্শন : মিশরের আল জামাতুল ইসলামিয়ার ক্ষেত্রে উক্ত নীতির বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত ইসলামি জামাআত মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তারা যখন নৈতিক পরিবর্তনের ঘোষণা দেয় তখন মিডিয়া ও ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো সহানুভূতিশীল হবার ভান করে।

২. তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ছড়িয়ে দেওয়া: আলজেরিয়ার সশস্ত্র ইসলামি জামাআতের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছে। উক্ত জামাআতের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা নির্বিচারে তাকফির করে নিজেদের বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদেরকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল। একপর্যায়ে তারা গোটা মুসলিম জাতিকে তাকফির করে।

তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হলো - সাম্প্রতিক আইএস। ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি ষোলআনা কাজে লাগিয়েছে। যে সময় জিহাদি দলসমূহের জন্য মুসলিম উম্মাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছিল অতি প্রয়োজনীয়, সে সময়টিতে তাদের বাড়াবাড়ি তাদেরকে উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো সবসময়ই বাড়াবাড়ি ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি বাস্তবায়ন করতে উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজতে থাকে। তাদের খোঁজখবর জেলখানার বন্দিদের থেকে শুরু করে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত সর্বত্রই চলতে থাকে।

ইরাকের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে যে, বাড়াবাড়ির বিস্তার প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। আইএসের বদৌলতে ধীরে ধীরে তা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে।

প্রথম দিকে ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ও মিডিয়া ব্যাপকভাবে তাদের বাড়াবাড়ি প্রচার করে এবং আইএসকে আল-কায়েদার সেকেন্ড জেনারেশন (২G) তথা উন্নত ও দ্বিতীয় প্রজন্ম বলে প্রচারণা চালায়। ফলে অনেকেই আইএসকে আল-কায়েদার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভাবতে থাকে এবং তাদের দলে ভিড়তে শুরু করে।

সেই সাথে আবু মুসআব যারকাভী রহিমাহুল্লাহ'র কিছু কঠোর অভিমতের আশ্রয় নিয়ে এমন একটি ধারনা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে যে, উক্ত ২G (আইএস) তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাস্তবে এই ২G বানিয়েছেন বাগদাদী, শাইখ যারকাভী নয়।

বাড়াবাড়ির সূচনা:

ইরাকে আমেরিকার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মতো আলেম-উলামা ছিল না বললেই চলে। উম্মাহর আলেমদের লক্ষ্যে এক বার্তায় (**الحاق بالقافله** কাফেলাবদ্ধ হও) শাইখ যারকাভী বলেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের মাঝে এমন কোনও আলেম পাবেন না, আমরা যার শরণাপন্ন হতে পারি'।

ইরাকে উলামায়ে কেরামের অনুপস্থিতির ফলে শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করে। সেইসাথে জিহাদি দলসমূহের মাঝে তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির প্রবণতা ছড়িয়ে পরে। ইরাকে বাড়াবাড়ি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটি ধারণা পাওয়া যায় শাইখ মায়সারা আল-গরীরের বক্তব্যে। তিনি ছিলেন আল-কায়েদার শরিয়া

বোর্ডের প্রধান। পরবর্তীতে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়ার শরিয়া বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

’الزرقاوي كماعرفته।’ (আমার দেখা যারকাভী) শিরোনামে এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘সৌদির এক যুবক ইরাকের জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছিল। জেলা পর্যায়ের একজন আমীর তাকে এই কারণে ফিরিয়ে দেন যে, সে শাইখ বিন বাজ ও শাইখ উসাইমীনকে তাকফির করে না’। শাইখ মায়সারা আল-গরীর বলেন, ‘শাইখ যারকাভী বিষয়টি জানতে পেরে খুব রাগান্বিত হন এবং বলেন, “জাজিরাতুল আরবের উক্ত ভাই বাদশা ফাহাদকে তাকফির না করলেও আমি তাকে জিহাদ থেকে বঞ্চিত করতাম না।”

মোটকথা, শাইখ মায়সারা শাইখ যারকাভীকে এবং বাড়াবাড়িতে লিপ্তদেরকে এক চোখে দেখতেন না। শাইখ যারকাভী আলেম-উলামাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন এবং তাদের থেকে তিনি শিক্ষাও গ্রহণ করেছেন। আর বর্তমানে যারা নিজেদেরকে শাইখ যারকাভীর অনুসারী বলে দাবি করছে তারা আলেম-উলামা ও ইলম থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করছে।

ইরাক থেকে ফিরে আসা লোকদের অধিকাংশই বাড়াবাড়ির ভাইরাস নিয়ে ফিরে আসে। জেলখানায় আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়েছে, ইরাক থেকে ফেরার পর তিনি বন্দি হয়েছিলেন। তিনি জেলখানায় ইখওয়ানের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতেন এবং তা প্রচার করতেন। তিনি লিখতেন, ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীন মুরতাদদের দল’। আমার উক্ত সঙ্গীর ইলম-কালাম মোটামুটি ছিল। তারই যখন এই অবস্থা তাহলে নিরক্ষরদের অবস্থা কী হতে পারে ভাবা যায়?!

আইএসের আবির্ভাবের পূর্বেই ইরাকের মাটিতে বাড়াবাড়ি বিদ্যমান ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাইশুল মুজাহিদিনের এক কমান্ডার আবু আব্দুল্লাহ মানসূরের রচিত (আদদাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ বাইনাল হাকীকতি ওয়াল ওহমি) নামক গ্রন্থে। কিতাবটির এক জায়গায় এসেছে, ‘বর্তমানে নেতৃত্ব - যাদেরকে তথাকথিত দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়া বলা হয়; নিঃসন্দেহে তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদিসহ আরও বহু অপকর্ম তারা খারেজীদের মত করেছে।’

বাড়াবাড়ি ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে জিহাদি সংগঠনসমূহের ভূমিকা:

বহু জিহাদি সংগঠন ইন্টারনেটে মুজাহিদগণের সংবাদ পরিবেশন করতো। উম্মাহর মাঝে মুজাহিদদের খবর পৌঁছানোর সাথে তারা বাড়াবাড়ি ধারনারও বিস্তার ঘটিয়েছিল। কারণ ইরাকের সংগঠনসমূহের সিংহভাগই ছিল বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের আদর্শের ধারক বাহক। তাই যুবকরা এসব মাধ্যম থেকে মুজাহিদগণের সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি বাড়াবাড়ির ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছিল।

এখানে আমি দুইটি ঘটনা উল্লেখ করব। আশাকরি এর মাধ্যমে জিহাদি যুবকদের উপর এই সংগঠনসমূহের প্রভাব এবং এগুলোর পেছনে যুবকদের ছুটে চলার প্রবণতা অনুমান করা যাবে।

প্রথম ঘটনা: আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহর একটি প্রবন্ধ 'ইখলাস আল-ইসলামিয়া ফোরামে' প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ইরাকের জিহাদ নিয়ে আলোচনা করেন। তার আলোচনায় তাদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও স্থান পায়। ফলে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরতে শাইখ যারকাভী নিজেই এগিয়ে আসেন। তিনি এ বিষয়ে তার বিবৃতি প্রকাশ করেন। এর শিরোনাম ছিল "আতিয়্যাতুল্লাহর বিষয় ছাড়ো; তিনি যা বলেন তা তিনি ভালো করে বুঝেই বলেন।"

উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'প্রথমেই শাইখকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে। আতিয়্যাতুল্লাহ আমার এবং তোমাদের বড় ভাই, আর আমি তোমাদের ছোট ভাই। প্রকৃত শাইখ তিনিই, আমি নই। আমি এসব বিনয় প্রকাশার্থে বলছি না, বরং এটিই বাস্তবতা।' অতঃপর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা: ইরাকের মুজাহিদগণ যখন 'দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়া' ঘোষণা করলেন তখন শাইখ হামিদ আলী এই ঘোষণার বিরোধিতা করেন। সংগঠনগুলো তার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠতে শুরু করলে তাকে পদচ্যুত করা হয়। অথচ তাকে ইরাকী জিহাদের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মাঝে গণ্য করা হয়।

ইরাকীদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আল-কায়েদা নিষ্ক্রিয় ছিল?

আইএসের আত্মপ্রকাশের পূর্বেও আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ ইরাকী মুজাহিদগণের বেশকিছু বিষয়ে সমালোচনা করতেন। সেগুলোর কয়েকটি হলো-

- তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা এবং ব্যাপক রক্তপাত ঘটানো।
- মসজিদ, বাজার ও গণজমায়েতে হামলা করা।
- সাধারণ ও নিরস্ত্র শিয়াদের উপর হামলা করা।
- ছুরি দিয়ে জবাই করা এবং তা ক্যামেরায় ধারণ করা।

এই বিষয়ে শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী, শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহসহ আল-কায়েদার আরও কতিপয় দায়িত্বশীলের বক্তৃতা, বিবৃতি ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর শাইখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসীর একটি বার্তা রয়েছে। বার্তাটির শিরোনাম 'শরিয়ত ও বাস্তবতার সঠিক ধারণা ছাড়া জিহাদের পরিণতি'।

শাইখ মাকদিসী আল-কায়েদার সাথে জড়িত নন। তবে তাঁকে বৈশ্বিক-জিহাদের পক্ষশক্তি গণ্য করা হয়। আল-কায়েদা যদিও উপরোক্ত বাড়াবাড়িমূলক কর্মকাণ্ড করত না, তবুও তারা জিহাদের স্বার্থে এবং মুজাহিদগণের ঐক্য অটুট রাখতে মঙ্গলকামিতা, নম্রতা ও সদুপদেশ প্রদানের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

মুজাহিদগণ কোনও কোনও সময় সেই সদুপদেশ শুনেছেন এবং মেনেছেন। তবে এখন যা ঘটছে তাতে চুপ থাকার বা শিথিলতা প্রদর্শনের কোনও সুযোগ নেই। জিহাদকে চরমভাবে বিকৃত করে আইএস ঘৃণ্য ও বীভৎস রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অগত্যা আল-কায়েদা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। শুধু আল-কায়েদাই নয় বরং সাধারণভাবে অন্য সকল জিহাদি তানজিম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

২১শে রবিউল আওয়াল ১৪৩৫ হিজরিতে আল-কায়েদার এক বিবৃতিতে এসেছে-

১. আল-কায়েদা ঘোষণা করছে যে, আদ দাওলাতুল ইসলামিয়া ফিল ইরাক ওয়াশ-শামের (আইএস) সাথে আল-কায়েদার কোনও সম্পর্ক নেই।

২. জিহাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে আল-কায়েদা কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে চায়। সেগুলোর একটি হলো, 'আমরা উম্মাহর অংশ' এবং উম্মাহর অংশ হয়েই থাকতে চাই। স্বেচ্ছাচারীর মতো উম্মাহর ঘাড়ে চেপে বসতে চাই না। আমীর বাছাই করার অধিকার উম্মাহর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাই না। আমরা ইসলামি ইমারত বা রাষ্ট্র ঘোষণার ক্ষেত্রে

তাড়াহুড়া করা পছন্দ করি না। বরং এক্ষেত্রে উলামায়ে মুজাহিদিন, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, সাধারণ মুজাহিদ ও মুসলিমগণের পরামর্শ গ্রহণকে আবশ্যক মনে করি। সেই সাথে উম্মাহর পরামর্শ গ্রহণকে আবশ্যক মনে করি। উম্মাহর পরামর্শ ছাড়া নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ইসলামি খিলাফাহ ঘোষণা করা এবং এর বিরোধিতাকারীদেরকে মুরতাদ ঘোষণার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর প্রশ্নই আসে না।

মূলত আল-কায়েদা এবং অপরাপর ইসলামি দলসমূহ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। তারা আলজেরিয়ার সশস্ত্র ইসলামি দলের বাড়াবাড়ির পরিণাম দেখেছেন। উক্ত বাড়াবাড়ির মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে। এসব বিবেচনায় আল-কায়েদা ও অপরাপর ইসলামি তানজিমসমূহ আইএসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছে।

জিহাদি নেতৃবৃন্দ এবং উলামায়ে কেরাম আইএস'কে 'খারেজি' বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনও দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই। তবে শাইখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসী তাদের অনেককে খারেজীদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

আইএসের ফিতনা জিহাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তবে তার কিছু ভালো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। এই ফিতনার পর যুবকরা অনেক কিছু শিখেছে, যা তারা পূর্বে জানত না। যদি আল-কায়েদার শাইখগণ এই ফিতনার বিরুদ্ধে কঠোর না হতেন এবং উম্মাহকে সতর্ক না করতেন তাহলে হয়তো সিংহভাগ মুজাহিদকে এই ফিতনা গ্রাস করে নিত।

তৃতীয় পর্যালোচনা : আল-কায়েদা ও আইএসের বিরোধের কারণসমূহ

১. তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। উক্ত তাকফিরের ভিত্তিতে হত্যা করা ও লড়াই করা।

২. খেলাফতের ঘোষণা।

৩. আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ (রাষ্ট্রনীতি)।

৪. রণকৌশল।

১. তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। উক্ত তাকফিরের ভিত্তিতে হত্যা করা ও লড়াই করা।

অন্যসব বিষয়ের মতো তাকফির করার ক্ষেত্রেও আল-কায়েদা আহলে সুন্নাহর নীতি অনুসরণ করে। অজ্ঞতা, তাবীলের অবকাশ, ইকরাহ (বাধ্যকরণ) এবং ভুলক্রমে কোনো কিছু ঘটে যাওয়াকে ওজর হিসেবে গণ্য করে। রক্তপাত ও মানুষের ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে আল-কায়েদা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে।

অপরদিকে, খাওয়ারিজুদ দাওলাহ তথা আইএসের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'নির্বিচারে তাকফির করা'। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহর নীতিমালার কোনও বালাই তাদের কাছে নেই। মুসলমানের রক্তের এবং তাঁর ধন-সম্পদের কানাকড়ি মূল্য তাদের কাছে আছে বলে মনে হয় না।

'কতলুল মাসলাহাহ' আইএসের নিজস্ব পরিভাষা। যখন কোনও ব্যক্তির অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হয় তখন তারা তাকে হত্যা করে দেয়। এটি তাদের মাঝে 'কতলুল মাসলাহাহ' নামে পরিচিত।

সন্দেহ নেই, গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। তবে যারাই গণতন্ত্র করে তাদের সকলেই আইএসের দৃষ্টিতে কাফের। মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডকে তারা তাকফির করেছে। এক্ষেত্রে তাকফিরের শর্তাবলী ও প্রতিবন্ধকসমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি।

অপরদিকে আল-কায়েদা যেহেতু আহলে সুন্নাহর অনুসারী, তাই তারা মুসলিম ব্রাদারহুডকে তাকফির করা থেকে বিরত থেকেছে। জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে কুরআন সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেওয়া, চার স্বাধীনতার (বিশ্বাসের স্বাধীনতা,মত প্রকাশের স্বাধীনতা,অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা) বিশ্বাস করা বা না করার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকদের ক্ষেত্রে তাকফিরের ফতোয়া ভিন্ন হতে পারে।

যারা গণতন্ত্রের উপরোক্ত নীতিমালায় বিশ্বাসী তারা সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হওয়ার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। অপরদিকে যারা গণতন্ত্রকে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে তাকফির করার সুযোগ কোথায়?! উভয় শ্রেণির মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে।

এখানে মুসলিম ব্রাদারহুডের আলোচনা করা হয়েছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। অন্যথায় আইএস প্রায় সকল ইসলামি দলকেই তাকফির করে। আর বিশ্বের সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে হাতেগোনা কিছু লোক তাদের তাকফিরের আওতামুক্ত থাকলে থাকতেও পারে।

অন্যায়ভাবে রক্তপাত করতে আইএস যে কতটা পারদর্শী, তা কারো অজানা নয়। মসজিদ ও মার্কেটে হামলা চালানো এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল-কায়েদা বরাবরই তাদের এহেন কর্মকাণ্ডের সাথে কোনও ধরণের সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দিয়ে আসছে।

আল-কায়েদা কখনোই ভুলের শিকার হয়নি, বিষয়টি এমন নয়। তবে স্বেচ্ছায় এবং জ্ঞাতসারে আল-কায়েদা তা করে না। সন্দেহ নেই, কোনও কোনও সময় ভুল করা স্বত্বেও সাওয়াব অর্জিত হয়।

২. খেলাফতের ঘোষণা:

খেলাফত সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে আল-কায়েদা আহলে সুন্নাহর নীতিমালা অনুসরণ করে। যেমন তামকিন (সক্ষমতা), আহলুল হাল ওয়াল আকদের দিকনির্দেশনায় উম্মাহকে খলীফা নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদান ইত্যাদি।

খাওয়ারেজুদ দাওলাহ (আইএস) এসব শর্তের পরোয়া করেনি। পরিপূর্ণ তামকিন তথা সক্ষমতা অর্জন ছাড়াই তারা খেলাফত ঘোষণা করেছে এবং এক্ষেত্রে আহলুল হাল ওয়াল আকদের মতামত তারা গ্রহণ করেনি। যারা বাগদাদীকে খলীফা বানিয়েছে তারা উম্মাহর প্রতিনিধি নয় এবং তারা কোনও কালে অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিল না। ইমামতে উযমা তথা খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান নিয়ে এই হলো তাদের অবহেলা ও অবজ্ঞার চিত্র।

আল-কায়েদা মনে করে, যে অঞ্চলে খেলাফত ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে শত্রুদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তারা মুসলিমদের যে কোনও উত্থানের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করতে পারছে। তাই সেখানে প্রকৃত তামকিন তথা সক্ষমতা অনুপস্থিত। সুতরাং যেখানে উম্মাহর কর্তৃত্ব নেই সেখানে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয় কীভাবে!

উপরন্ত খেলাফত ঘোষণার পর উম্মাহ শাসিত হচ্ছে এমন সব দুরাচারীদের মাধ্যমে, যারা উম্মাহর স্বার্থের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তাইতো তাদের ওখানে আহলুল হাল ওয়াল আকদের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং খলীফা নির্বাচিত হয় কীভাবে!

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا»

অর্থঃ "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ ইমাম ঢাল সদৃশ, যার আড়ালে লোকে যুদ্ধ করে এবং তার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে। যদি ইমাম আল্লাহ্র ভয়ের আদেশ করে এবং ইনসাফের সাথে আদেশ করে, তবে এর জন্য তার সওয়াব রয়েছে। আর যদি এর অন্যথা করে, তবে তার উপর এর পরিণতি বর্তাবে"। (সুনানে আন-নাসায়ী - ৪১৯৬)।

তাই ভাবতেও অবাক লাগে, পালিয়ে বেড়ানো তথাকথিত খলিফা যিনি নিজের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তিনি কিভাবে দেড় বিলিয়ন মুসলিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন!

খলীফা নির্বাচনের অধিকার উম্মাহর। এ মর্মে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র বাণী বুখারি শরীফে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

"আমার কাছে একথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ একথা বলেছে যে, আল্লাহর কসম! যদি উমর মারা যায় তাহলে আমি অমুকের হাতে বাইআত দিবো। কেউ যেন একথা বলে ধোঁকায় না পড়ে যে, আবু বকরের বাইআত ছিল আকস্মিক ঘটনা তবুও তা সংঘটিত হয়ে হয়েছে। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এমন ছিল, তবে আল্লাহ এ বাইআতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। তোমাদের কেউ আবু বকর রাযি. এর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না। যে কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোনও লোকের হাতে

বাইআত দিবে, তার অনুসরণ করা যাবে না। ওই লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩. আস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ: ইসলামী রাষ্ট্রনীতি

এ ক্ষেত্রে আল-কায়েদা এমন ভাষা ব্যবহার করে যা সর্বসাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ এবং কর্মতৎপরতার জন্য এমন নীতি গ্রহণ করে যা সর্বসাধারণের রুচিবোধ ও বিবেকের সাথে মানানসই। যথাসম্ভব এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকে যা মানুষকে স্বজাতিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

আল-কায়েদার বিশ্বাস, সর্বসাধারণকে ব্যাপকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করানো না গেলে চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব হয়ে উঠবে না। এপথেই আল-কায়েদা চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সম্ভাব্য সকল উপায়ে উম্মাহকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে, পরিবর্তন আনতে হলে জিহাদের বিকল্প নেই।

উম্মাহর সন্তানদের মাঝে শরিয়তের জ্ঞান কম থাকার বিষয়টি আল-কায়েদা সর্বদা বিবেচনায় রাখে। যে সকল বিষয় বৈধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে জিহাদ-বিমুখ করতে পারে বলে ধারণা হয়, সেগুলো আল-কায়েদা পরিহার করে। অপরদিকে আইএসকে ঠিক এর উল্টোটি করতে দেখা যায়। বক্তব্যের ক্ষেত্রে তারা এমন দুর্বোধ্য কৌশল গ্রহণ করে যা সর্বসাধারণ বুঝতে সক্ষম নয়। আর কাজের ক্ষেত্রে তাদের নীতি মানুষকে জিহাদবিমুখ করে তোলে। যেমন- আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা। এ সকল কর্মকাণ্ড মানুষকে শুধু জিহাদবিমুখই করে না বরং এগুলো শরিয়ত বিরোধীও।

শরিয়ত সর্বক্ষেত্রে মানুষকে দয়া ও অনুগ্রহশীল হওয়ার আদেশ করে। মুসলিম সহ অন্যান্য হাদিসে এসেছে –

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

অর্থঃ “শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দু'টি বিষয় স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ (ইহসান করা) ফরয করেছেন। অতএব তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে। আর যখন কোন জন্তু যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকে যেন ছুরি ধার দিয়ে নেয়। আর যবেহকৃত পশুকে ঠান্ডা হতে দেয়"। (সুনানে আন-নাসায়ী - ৪৪০৫)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে হত্যা করার ক্ষেত্রে এবং পশু জবেহের ক্ষেত্রে দয়াশীল হওয়ার আদেশ করেছেন। আর আইএস বেশি কষ্ট দেয়ার জন্য পাশবিক ও নির্মমভাবে হত্যা করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলা করতে (নিহত ব্যক্তির নাক-কান ইত্যাদি কাটতে) নিষেধ করেছেন। আর বাগদাদীর দল হত্যার পর মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার ছবি গর্বের সঙ্গে প্রচার করে।

তাদের অনেকে দাহ্য পদার্থ দিয়েও মানুষ হত্যা করেছে। সুতরাং রাসূলের শরিয়ত কোথায় আর তারা কোথায়? তারা কি এসব পন্থায় শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করছে?!

৪. রণকৌশল:

আল-কায়েদা স্থানীয় শাসকদের পরিবর্তে বহিঃশত্রু তথা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করাকে প্রাধান্য দেয়। আত্মরক্ষার্থে বা এদেরকে (স্থানীয় শাসকবর্গকে) শায়েস্তা করা জরুরি হয়ে পড়লেই কেবল আঞ্চলিক তাবেদারদের সাথে লড়াই করে।

বহিঃশত্রু হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। স্থানীয় সরকারগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার। বহিঃশত্রুর সাহায্য ছাড়া এরা নিতান্তই দুর্বল। বহিঃশত্রুকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানোর রহস্য এখানেই।

অপরদিকে আইএসের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্থানীয় শত্রুরা। নির্বোধের মতো তারা ভাবছে, তারা এমন কিছু করতে পেরেছে যা পূর্ববর্তীরা পারেনি। কে জানে, হয়তো তারা ভাবছে, আমেরিকার সাথে জিহাদে না জড়িয়ে স্থানীয় শত্রুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমেরিকা তাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবে না!!

বাস্তবতাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করাই তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণ। টিনের চশমাটা খুলে যদি ডানে-বামে একটু তাকাত তাহলে তারা বুঝতে পারত যে, গোটা

পৃথিবী ইহুদি ও খৃস্টানদের যৌথ সিস্টেমে আবদ্ধ। যে কেউ এই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে তাদের দৃষ্টিতে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

আশাকরি এমন চিন্তা কেউ করবে না যে, তারা তাদের মোড়লগিরীর শৃঙ্খল ভাঙ্গাতেও নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। এমন চিন্তা কেবল সেই করতে পারে যার মাথায় আইএসের মগজ ঢুকানো হয়েছে।

অবশ্য আমেরিকার প্রতি আইএসের সুধারণা যে ভুল ছিল তা বুঝতে তাদের খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। তারা নিজেদের তথাকথিত খেলাফত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আর এখন তাদের খেলাফতের ধ্বংসাবশেষটুকুই কেবল অবশিষ্ট আছে। আর এই তথাকথিত খেলাফত অস্তিত্বের সংকটের মুখে পড়েছে।

পরিশিষ্ট

যারা বলেছিল যে, আইএস সৃষ্টির পেছনে সি.আই.এ সহ আরও কিছু ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হাত আছে, তারা খুব মন্দ বলেনি। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এসব গোয়েন্দা বাহিনী আইএসকে সৃষ্টি করেছে। আমি কেবল বলতে চাচ্ছি, এরা আইএসের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে এবং উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দিয়েছে।

তারা কেন আইএসকে সাহায্য করেছিল? কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ

- আইএসের প্রধান টার্গেট স্থানীয়রা, আমেরিকা নয়। আর আল-কায়েদার প্রধান টার্গেট আমেরিকা, স্থানীয়রা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

- আইএসের কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে জিহাদকে বিকৃত করে তুলে, জিহাদবিমুখ করে, আর এটি মূলত আমেরিকা ও যারা জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে ধ্বংস করতে চায় তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

- আইএস নিজেদের সদস্য ও সৈনিকদের ব্যাপারে যত্নবান নয়। আইএস নিজ সেনাদেরকে অনেক সময় নিরর্থক যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দেয়, ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। কুবানী, বাইজী ও ইত্রাদি অঞ্চলে এমনটিই দেখা গেছে। আর মসুলে তো তারা নিজেরাই নিজেদের সেনাভর্তি সাজোয়া যান বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।

৯. ইয়েমেনের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহের সাথে আল-কায়েদার কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি?

উত্তর : প্রশ্নটি নিতান্তই হাস্যকর। তবে এ ধরনের অপপ্রচারকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী কিছু লোকও আছে, তাই আমাকে এমন একটি অন্তঃসারশূন্য প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট বিষয়কেও ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হয়। যদি বিবেকবানরা একটু বিবেক খাটাত তাহলে বিষয়টি বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হতো না।

এ প্রশ্নের উত্তরে কাকতালীয়ভাবে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বলব। আশাকরি এর মাধ্যমে প্রশ্নটির বাতুলতা প্রকাশ পাবে।

সালেহের বিরুদ্ধে ইয়েমেনে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগের কথা। আমি কথা বলছিলাম এক ভার্সিটির ছাত্রের সাথে। তার অধ্যয়নের বিষয় ছিল উলুমে শরিয়াহ। উক্ত ভাই সালেহের ভক্ত ছিল। তিনি সালেহের পক্ষে বলছিলেন। আমি জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত বিধায় তাকে সালেহের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উৎসাহিত করছিলাম। এক পর্যায়ে আমি বললাম, 'সালেহের জুলুম ও পাপাচারের কারণে আমি তাকে ঘৃণা করি'। তখন সে আবেগতাড়িত হয়ে বলল, أحبه فى الله আমি সালেহকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। অতঃপর সে তার এক শাইখের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে। শাইখ তাকে বললেন, 'সালেহকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি' বলা সঠিক হয়নি। এর কিছুদিন পর সালেহ সরকার আমাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। জেলের এক সেলে আমাকে থাকতে হয়েছে কয়েক বছর। বিদ্রোহের পর আমি জেল থেকে বেরিয়ে আসি। ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকে। সালেহ রাফেজীদের সাথে জোট বাধে এবং রাফেজী-শিয়ারা ইয়েমেনে কর্তৃত্ব বিস্তার করে। মানুষ দলে দলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। আমি এবং আমার সেই ইউনিভার্সিটির ভাইও লড়াইকারীদের মাঝে ছিলাম।

পরবর্তী সময়ে হঠাৎ একদিন এই ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাকে দেখতে পেলাম সে এই বলে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, আল-কায়েদা তলে তলে সালেহের মিত্র!

সুবহানাল্লাহ! যারা কিছুদিন পূর্বে সালেহের মিত্র ছিল তাদেরকে তিনি শত্রুতে পরিণত করলেন। আর আমরা কিনা হয়ে গেলাম সালেহের মিত্র!

যারা কিছুদিন পূর্বে সালেহের সেবায় নিয়োজিত ছিল, যারা নিপুণভাবে তার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করেছে এবং বিনিময়ে পেয়েছে অঢেল ধন-সম্পদ, সেই তারাই আজ আমাদেরকে বলছে সালেহের মিত্র। অথচ তারা যখন সালেহ সরকারের পয়সায় বিলাসিতায় মত্ত, তখন আমাদেরকে থাকতে হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, পাহাড়ে, জঙ্গলে।

সালেহ এর আল-কায়েদা বলতে তারা যা বুঝায়, আসলে এর কোনও অস্তিত্ব নেই। যারা এমন প্রচারণা চালাচ্ছে তারা মিথ্যাচার করছে।

অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তারা তো মাকিয়াভেল্লি কূটরাজনীতিতে বিশ্বাসী। যার বক্তব্য হলো The End Justifies the means. অর্থাৎ কোনও কাজ নৈতিক না অনৈতিক তা নির্ভর করে ফলাফলের উপর। সুতরাং তাদের মতে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চুরি করতেও বাধা নেই। যাইহোক এই কূটরাজনীতিই সালেহকে দায়মুক্তি ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার দিয়েছে এবং বিচার ও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সালেহ অত্যন্ত ধুরন্ধর ও কূটবুদ্ধিতে পটু। এই অতিবুদ্ধি তাকে হুথিদের পদতলে নিক্ষেপ করেছে, হুথিদের অনুগ্রহে সে এখন চরম লাঞ্চনাকর অবস্থায় বেঁচে আছে।

বাস্তবেই যদি ‘কায়েদাতু আফফাশ’ তথা সালেহের মিত্র বলে কোনও আল-কায়েদা থাকত আর তারা আল-কায়েদার নামে সালেহের সাথে মিত্রতার মতো ঘৃণ্য কাজ করত এবং আল কায়েদার ব্যানারে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাতো তাহলে কি আল কায়েদা নীরব থাকত? আল-কায়েদা কি এদের অনুসরণ না করার ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট বার্তা প্রকাশ করে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করত না!?

আইএস যখন সানার মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তখন আল-কায়েদা নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, আল-কায়েদা মসজিদকে যুদ্ধক্ষেত্র বানায় না। আইএসের সাথে আল-কায়েদার কোনোরূপ সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও সংশয় নিরসন করতে আল-কায়েদার নামে যদি কোনও গ্রুপ এমনটি করত, তবে কি আল-কায়েদা নিজের অবস্থান ব্যক্ত করত না?

কেউ বলতে পারে যে, সালেহ আফ্‌ফাশের ‘কায়েদাতু আফফাশ’ বলতে ভিন্ন কোনও আল-কায়েদা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল-কায়েদার প্রথম

সারির কিছু নেতা সালেহের মিত্র। সালেহ তাদেরকে হয়তো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। প্রমাণ হিসেবে হয়তো নিম্নোক্ত ঘটনাবলী দেখানো হতে পারে-

- পলিটিকাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের কারাগার থেকে আল-কায়েদা সদস্যদের পালাতে সক্ষম হওয়া।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরিয়ার উরজি হাসপাতালে হামলা চালানো।
- সানার সাবয়ীন প্রাঙ্গণে সেনাদের উপর হামলা।

প্রশ্নকারীর আরও অভিযোগ হলো, বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে সালেহ সরকার নাকি আবিয়ানের নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছায় আল-কায়েদার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে আল জাজিরা চ্যানেলকে হাজির করা হতে পারে।

মুখরিবুল কায়েদা তথা আল-কায়েদার সংবাদদাতা শিরোনামে প্রচারিত তথ্যচিত্রে দাবি করা হয়েছে যে, আল-কায়েদার সিংহভাগ নেতা সালেহের অনুগত। সেখানে আরও দাবি করা হয় যে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের প্রধান আম্মার মুহাম্মদ আল জাজিরাকে বলেছেন, তিনি এখন যে চেয়ারে বসেছেন পূর্বে সেখানে আল-কায়েদার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বসতেন!!

বর্ণিত অভিযোগসমূহ একটি একটি করে খণ্ডন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল-কায়েদার সিংহভাগ নেতা সালেহের অনুগত বলে আল জাজিরা যে সংবাদ প্রচার করেছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, তানজিম আল-কায়েদার জাজিরাতুল আরব শাখার প্রধান শাইখ আবু নাসের উহাইশীসহ অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমেরিকা ও তার অনুগতদের (সালেহ নিজেও অন্তর্ভুক্ত) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন। বাস্তবেই যদি আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সালেহের অনুগত কেউ থাকত তাহলে কিছুতেই তা গোপন থাকত না।

তাছাড়া এটা কি যৌক্তিক যে, চলা-ফেরা ও উঠা-বসায় যে লোকটি দীর্ঘদিন আল-কায়েদার সাথে থাকবে তার সন্দেহজনক গতিবিধি কারোরই নজরে পড়বে না? অথচ আল-কায়েদার অনুগত গোয়েন্দাবাহিনী শত্রু-গোয়েন্দাদের বহু রহস্য উদঘাটন করেছে এবং অনেককে নজরদারীর আওতায় এনেছে। আর যেসব শত্রু-

গোয়েন্দা কিছুটা সফল হয়েছে, তারা যা কিছু করতে পেরেছে তা হলো, আমেরিকার বিমানবাহিনীকে আমাদের অবস্থান জানানো, ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার রহস্য উদঘাটন অথবা কোনও গোপন তথ্য প্রেরণ। তবে পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একসময় শত্রু-গোয়েন্দা ধরা পড়ে যায়।

সে যাইহোক, শুধু আল-কায়েদা কেন, বিশ্বের কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রই এ দাবী করতে পারবে না যে, তাদের মাঝে শত্রুদের কোনও গোয়েন্দা নেই। তবে এতটুকু জেনে রাখা উচিৎ যে, কোনও শত্রু-গোয়েন্দা আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ঢুকতে পারে না। কারণ জিহাদ এবং জিহাদের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাসহ সামগ্রিক বিষয়াবলীর খুঁটিনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পূর্বে কেউ আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পৌঁছাতে পারে না। যেহেতু স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান টার্গেট আল-কায়েদা, তাই দায়িত্বশীল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এতটা সতর্কতা অবলম্বন না করা হলে আল-কায়েদা অনেক আগেই তার আদর্শ ও গতিপথ থেকে বিচ্যুত হতো। এর অতিসাম্প্রতিক নজির হলো আইএস। তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এমন কিছু লোক পৌঁছাতে পেরেছে, যারা প্রান্তিক চেতনাধারী। তাদের মাঝে কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তিও রয়েছে। এমনকি নেতাদের মাঝে কতক রয়েছে শত্রুদের নিয়োগকৃত এজেন্ট। এখন আইএসের সার্বিক অবস্থা কোন পর্যায়ে নেমেছে তা কারও অজানা নয়।

পক্ষান্তরে আল-কায়েদা প্রায় দুই যুগ ধরে জিহাদের ময়দানে রয়েছে। তারা এখনো তাদের মূলনীতির উপর পূর্বের মতোই অবিচল। কোনও কিছু তাদেরকে কেন্দ্রবিন্দু থেকে চুল পরিমাণ এদিক-সেদিক করতে পারেনি। এর মাধ্যমে কি প্রমাণিত হয় না যে, এই দীর্ঘ সময়ে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অযাচিত অনুপ্রবেশের মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি? যদি এমনটি হয়ে থাকত তাহলে অবশ্যই এর প্রভাব পড়ত আল-কায়েদার নীতি-আদর্শে ও কৌশলে।

শাইখ আবু হুরায়রা কাসিম আর-রিমীর বিরুদ্ধে সালেহের পক্ষে কাজ করার অপবাদ

অনেককে বলতে শোনা যায় যে, আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের প্রধান আম্মারের সাথে শাইখ কাসিমের গোপন সম্পর্ক রয়েছে এবং তারাই তাকে সুকৌশলে আল-কায়েদার নেতৃত্বে বসিয়েছে। এ ধরনের

প্রচারণায় আমি মোটেও বিস্মিত নই। কারণ এটি সিক্রেট এজেন্সির প্রচারণা এবং এ থেকে এরা ফায়দা লুটছে। এটি তাদের পুরনো কৌশল।

জেলখানায় থাকাকালে এসব নিজ কানে শুনেছি এবং নিজ চোখে দেখেছি। এসব প্রচারণার মাধ্যমে বহুবার তারা ভাইদের মাঝে বিভেদের বীজ বপনের অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাই এসব প্রচারণায় আমি মোটেও বিস্মিত নই। তবে বিস্মিত হই সেইসব লোকের প্রতি যারা এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা নির্বোধের মতো বিশ্বাস করে।

শাইখ কাসিম আল-কায়েদার নেতৃত্বে উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। তিনি পূর্ব থেকেই মুজাহিদগণের মাঝে পরিচিত। শাইখ কাসিম সালাফি ভাবধারায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ইবনুস সানআনী থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তারপর চলে যান আফগানিস্তানে। সেখানে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সেখানে আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। শাইখ উসামা ও শাইখ যাওয়াহিরী সহ আল-কায়েদার অনেক নেতৃবৃন্দের সাথে তার ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। আর ইয়েমেনে ছোট বড় সকল মুজাহিদের কাছে তিনি পরিচিত।

কতিপয় সিক্রেট এজেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পিকচার পোস্ট করেছে। তাতে দেখা যায় যে, সালেহের পাশে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। যারা ছবিটি পোস্ট করেছে, তাদের দাবি পাশের লোকটি শাইখ কাসিম রিমি। অথচ বাস্তবে শাইখের ছবির সাথে উক্ত ছবির সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। আর প্রকৃতই যদি সালেহের সাথে শাইখের সম্পর্ক থাকত তাহলে কি তিনি সালেহকে নিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতেন? হায়রে বিবেক!

সানার পলিটিকাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের জেল থেকে মুজাহিদ ভাইদের পলায়ন

সালেহের সাথে আল-কায়েদার সম্পর্ক আছে বলে যারা প্রমাণ করতে চায় তারা বলে যে, সালেহই তাদের পলায়নের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নয়তো তারা সেখান থেকে পালাতে পারত না। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, জেল থেকে পালানোকে তারা অসম্ভব মনে করেন। তারা যদি ইনসাফের সাথে একটু খোঁজ নিতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, পলিটিকাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের চেয়ে হাজার গুন বেশি নিরাপদ জেল থেকেও পালানোর ঘটনা ঘটেছে।

শাইখ আবুল লাইস আল লীবি সৌদির রুয়াইস জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছেন, এর সিকিউরিটি ব্যবস্থা পলিটিকাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশন জেল থেকে শত গুনে উন্নত। তেমনি মার্কিন সেনাদের নিয়ন্ত্রিত বাগরাম জেল থেকে শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল লীবি কতিপয় সঙ্গীসহ পালাতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ বাগরাম জেল মার্কিন সেনাদের ঘাটির মাঝে অবস্থিত।

পলিটিকাল সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের (পি.এস.এ) যেই সেলে মুজাহিদ ভাইয়েরা ছিলেন, সেখান থেকে জেলখানার প্রাচীর ছিল সামান্য দূরত্বে। আমি নিজেও একসময় সেই জেলে ছিলাম বলে নিজ চোখে তা দেখেছি। ভাইদের পালানোর পর মার্কিন কর্তৃপক্ষ তদন্তের স্বার্থে সেই সেল সিলগালা করে দেয়। ইয়েমেনে সরকার বিরোধী বিদ্রোহের পর তা পুনরায় খোলা হয়। যদি মার্কিনীদের কাছে সালেহের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হতো তাহলে সে তাদের হাত থেকে রেহাই পেতো না। আমেরিকা এসব ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেয় না। জেলখানায় থাকা কতিপয় মুজাহিদ ভাইকে ঘটনাস্থলে এনে মার্কিনীরা বহুবার তদন্ত করেছে।

ভাইদের পালানোর পর পি.এস.এ-এর সাবেক চীফ গালিব আল-কামশ ঘোষণা দিয়েছেন যে, পালিয়ে যাওয়াদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অনেক ভাই আত্মসমর্পণ করেছেন। গালিব প্রতিশ্রুতি মাফিক তাদেরকে ছেড়ে দেয়। তবে জামাল বাদাইর ব্যাপারে সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। সে তাকে বন্দি করে ফেলে। উল্লেখ্য, শাইখ আবু বাসীর উহাইশী, কাসিম রিমীসহ আরও অনেকে তাকে আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ফলে গালিব তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। তিনি এখন পর্যন্ত পি.এস.এ'র জেলে বন্দি আছেন।

আত্মসমর্পণকারী কতিপয় ভাইকে ছেড়ে দেওয়া ছিল গালিবের কৌশল। এর মাধ্যমে সে শাইখ আবু বাসীর, আবু হুরাইরা জামাল বাদাভী, গরীব তাইজী ও হামজা কুআইতীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে আটক করতে চেয়েছিল। কারণ জেল থেকে পালানোর পর তারা গালিবদের জন্য নরকের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। গালিবরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। আর জামাল বাদাইতো মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএস কোলের অপারেশনে সরাসরি জড়িত ছিলেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও উরজী হাসপাতালে হামলা

উক্ত হামলার মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হেডকোয়ার্টার। এখান থেকেই ড্রোনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উক্ত হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ ও পরিকল্পনার সময় ভাইয়েরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, যেন কোনও নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি না ঘটে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেইট জনবসতির সন্নিকটে হওয়ায় বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে তুলনামূলক কম। শুধু তাই নয়, একটি জানাজার কারণে সেখানে লোক সমাগম বেশি হওয়ায় হামলাকে একদিন পেছানো হয়েছে।

এক পর্যায়ে আমাদের নয় ভাই পরিকল্পনা মাফিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু এক ভাই চলে যায় উরজী হাসপাতালে। হাসপাতালটি মন্ত্রণালয়ের ভেতরেই অবস্থিত। হাসপাতালের ক্লোজ সার্কিট টিভি ক্যামেরা তার হামলার চিত্র প্রকাশ করেছে। ইয়েমেনের বিপথগামী মিডিয়া তাদের স্বভাব অনুযায়ী কেবল সেই বিচ্ছিন্ন ভাইয়ের কর্মকাণ্ড প্রচার করেছে। আর হেডকোয়ার্টারে হামলাকারী অবশিষ্ট আট ভাইয়ের অপারেশনের বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেছে।

উক্ত বিচ্ছিন্ন ভাই পরিকল্পনার বাহিরে গিয়ে হাসপাতাল ভবনে হামলা করার কারণে আল-কায়েদার সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবুও আল-কায়েদা উক্ত হামলার দায়ভার স্বীকার করেছে। অথচ এ বিষয়ে নীরব থাকা তাদের জন্য কঠিন কিছু ছিল না। আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা এবং ইসলামি শরিয়াহমাফিক উক্ত হামলার যতটুকু দায়ভার বর্তায় তা বহন করার তাড়না থেকেই মূলত এই হামলার স্বীকারোক্তি।

১৪৩৫ হিজরির সফর মাসে আল-কায়েদার বিবৃতিতে বলা হয়েছে-

"ইয়েমেনী মিডিয়া যা প্রচার করেছে তা আমরা দেখেছি। এক সশস্ত্র ব্যক্তি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাসপাতালে হামলা করেছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন ভুলক্রমে সত্তর জনকে হত্যা করেছিলেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন আমরাও তাই বলছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই'। আমরাও বলছি, 'হে আল্লাহ! আমাদের এক ভাই যা করেছে তার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই'।

আমরা তাকে এমনটি করতে আদেশ করিনি। আমরা তার কাজে সন্তুষ্ট নই, বরং এ ঘটনায় আমরা ব্যথিত হয়েছি। আমরা এভাবে লড়াই করি না। এভাবে হামলা করতে কাউকে উৎসাহিত করি না। এটা আমাদের মানহাজ নয়। আমরা তো ভাইদেরকে সতর্ক করেছিলাম যে, হাসপাতাল ও মসজিদে কিছুতেই হামলা চালানো যাবে না। অতঃপর আমাদের আট ভাই সতর্ক হলো এবং এক ভাই সতর্ক হলো না। আল্লাহ তার উপর রহম করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন।

আমরা অপরাধ ও ভুল স্বীকার করছি এবং হতাহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের পরিবারের যারা হতাহত হয়েছে তাদেরকে আঘাত করার ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না। একে আমাদের দ্বীন সমর্থন করে না। তাছাড়া এমন হামলা আমাদের নীতিতেও নেই। হাসপাতালে হামলার ঘটনায় দিয়্যাত, ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা খরচসহ আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের ব্যয়ভার আমরা বহন করব। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী আরও যা যা করণীয় তার সবই আমরা করব। কারণ আমরা শরিয়তের প্রতি আহ্বানকারী; শরিয়তের ধ্বংসকারী নই”।

আমি নিজে সাক্ষী, উক্ত হামলার ব্যাপারে ভাইয়েরা আমার সাথে এবং আমার এক সঙ্গীর সাথে সাক্ষাত করত এবং পরিবারের সাথে দিয়্যাত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে তাগাদা দিত।

যদি তারা দ্বীনের প্রকৃত অনুসারী না হতো তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের জন্য খুঁজে বেড়াত না। কারণ কেউই নিজ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে নি।

আল সাবিন স্কোয়ারে হামলা

যারা সালেহের সাথে আল-কায়েদার সম্পৃক্ততা প্রমাণ করার চেষ্টা করে তারা বলে, সালেহ সুযোগ না দিলে আল-কায়েদা সাবয়ীন প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারত না।

আল-কায়েদার সক্ষমতা নিয়ে যারা চরম অজ্ঞতার শিকার কেবল তারাই এমন কথা বলতে পারে। আল-কায়েদা এর চেয়ে বহুগুণে সুরক্ষিত স্থানে হামলা চালাতে সক্ষম। এমনকি যে সকল তানজিম জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ নয় তাদের দ্বারাও অনুরূপ হামলার ঘটনা ঘটেছে।

মিসরের আল জামাআতুল ইসলামিয়ার কতিপয় সদস্য আনোয়ার সাদাতের স্টেজের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। সাদাত, হুসনে মোবারক ও অন্যান্য অফিসারদের সাথে সেই মঞ্চে বসা ছিল। তারা তাকে এদের মাঝেই হত্যা করেছিলেন।

বহুবার আল-কায়েদা নিরাপত্তা সংস্থা ও শত্রু সেনাদের মধ্য থেকে নিজেদের সদস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। যে ভাই সাবয়ীনে ইসতেশহাদী হামলা চালিয়েছেন তিনিও সেনাসদস্য ছিলেন। পরিকল্পনা ছিল স্টেজে অর্থাৎ সেনা অফিসারদের উপর হামলা চালানোর। সম্ভবত এই ভাই স্টেজে পৌঁছাতে পারেননি, ফলে সেনাদের মাঝেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল; সাবয়ীনে নিহত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সেনাদের জন্য কিছু লোক মায়াকান্না করছে! এই সেনারা যখন আন্দোলনকারীদেরকে হত্যা করছিল, যখন জেলখানায় আমাদেরকে অমানুষিক শাস্তি দিচ্ছিল তখন তাদের মায়াকান্না কোথায় ছিল? আজও তারা আহলুস সুন্নাহকে হত্যা করছে। তারা এখন হুথিদের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছে।

তাদের মায়াকান্না কেবল সেনাদের জন্যই সংরক্ষিত। এই সেনাদের হাতে নিহত সাধারণ মানুষ ও মুজাহিদদের জন্য কখনোই তাদের কান্না আসে না।

আবিয়ানের নিয়ন্ত্রণভার আল-কায়েদার হাতে কি সালেহ দিয়েছিল? ঈমানের বলে বলীয়ান মুজাহিদদের সামনে এ সকল সৈনিকরা যে কতটা দুর্বল তা অনেকেরই জানা নেই। মুজাহিদদের হাতে যখন শীতকালের পাতার মতো একের পর এক সেনাঘাটিগুলোর পতন ঘটে তখন অনেকে ভাবতে থাকে যে এটি কোনও চক্রান্ত। আবিয়ানে সালেহের সেনানিবাসের পতনেও এমনটি বলা হচ্ছে। অথচ আবিয়ান ও অন্যান্য অঞ্চলে আল-কায়েদার হাতে যে সকল সেনাঘাটির পতন ঘটেছে সেগুলোর কোনোটিতে হামলাকারী মুজাহিদের সংখ্যা একশ'র বেশি ছিল না। ৩৫নং ব্রিগেডের সেনাদেরকে মাত্র ত্রিশজন মুজাহিদ দীর্ঘদিন অবরোধ করে রেখেছিল। সালেহ এবং হাদীর আমলে মুজাহিদদের ছোট ছোট দলের হাতে বহু সেনাঘাটির পতন ঘটেছে। এগুলো কেউই অস্বীকার করে না।

ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হাদী (বর্তমানে সৌদিতে নির্বাসিত) মনে করে যে, সে আল-কায়েদার হাত থেকে আবিয়ানকে মুক্ত করেছে। বস্তুত আল-কায়েদা নিজ থেকেই আবিয়ান ছেড়ে চলে গেছে। যেমনটি পূর্বে মুকাল্লায় দেখা গেছে। বেরিয়ে যাওয়ার

সময় আল-কায়েদা ছোটখাটো কিছু সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এসবের উদ্দেশ্য ছিল বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখা। অন্যথায় আল-কায়েদা তো এখনো বিদ্যমান। আল-কায়েদাকে তারা শেষ করে দিচ্ছে না কেন?

অধিকৃত অঞ্চল থেকে আল-কায়েদা সুশৃঙ্খলভাবে সরে পড়েছে। কারণ সেখানে দীর্ঘ সময় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল না। তারা মূলত মানুষের কাছে তাদের দাওয়াহ পৌঁছাতে চেয়েছিল এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিল। যাতে মানুষ ইসলামের ন্যায়-নিষ্ঠতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, শরিয়াহ থেকে দূরে থাকাই জুলুম, অত্যাচার ও পাপাচারের মূল কারণ।

আল-কায়েদার নামে আল জাজিরার মিথ্যাচার

আল জাজিরা চ্যানেলে আল-কায়েদা নিয়ে যে পরিমাণ মিথ্যাচার করা হয়েছে তার সবগুলোর আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। আল জাজিরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সালেহের সাথে আল-কায়েদার সম্পৃক্ততা রয়েছে। ইতঃপূর্বে বিষয়টি খণ্ডন করা হয়েছে। তবে এখানে আরও কিছু কথা যোগ করা হলো-

আমেরিকার কাছে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইস্যু। এনিয়ে কোনও সরকারের লুকোচুরি তারা বরদাশত করে না। কোনওভাবে কারো সাথে এর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে তা তারা শক্ত হাতে দমন করে। জঙ্গিবাদে অর্থায়নের অভিযোগে আমেরিকা বহু সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করেছে। আল হারামাইন ফাউন্ডেশনের মতো চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানগুলো এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আল-কায়েদার কোনো সদস্যের সাথে সামান্য যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে অনেক শাইখের নাম কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আল-কায়েদার সাথে সালেহের কোনও সম্পৃক্ততা যদি থাকত তাহলে সালেহ কিছুতেই আমেরিকার হাত থেকে রেহাই পেত না।

১০. আল-কায়েদা কি হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আল-কায়েদার কোনও ফ্রন্ট রয়েছে কি?

উত্তর : আল-কায়েদার বড় একটি লক্ষ্য হচ্ছে উম্মাহকে ব্যাপকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করানো। এজন্য স্থানীয় শত্রুদের সাথে যথাসম্ভব সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রাধান্য দেয়। কারণ আমেরিকাকে সবাই শত্রু মনে করে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সাধারণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

আল-কায়েদার আরও একটি লক্ষ্য হচ্ছে, উম্মাহর দ্বীন, মর্যাদা ও তাদের ধন-সম্পদের হিফাজত করা। সুতরাং এসব লক্ষ্যে যারা আঘাত হানবে স্বভাবতই আল-কায়েদা তাদেরকে প্রতিহত করবে। হুথিদেরকে প্রতিরোধ করতে উম্মাহ্ যখন যুদ্ধ করছে তখন আল-কায়েদার পিছিয়ে থাকার প্রশ্নই আসে না।

সালাফিদের উপর যখন হুথিরা হামলা করল তখন তাদের সহায়তায় সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিল আল-কায়েদা। কাতাফ অঞ্চলে হুথিদের সাথে যুদ্ধ করতে আল-কায়দার আলাদা ফ্রন্ট রয়েছে। হুথিদের বিরুদ্ধে অপারেশনসমূহের একটি হলো, বদরুদ্দিন হুথিকে হত্যার সফল অপারেশন। সে হুথিদের ধর্মগুরু ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিল। তাকে হুথিদের বড় আলেমদের মাঝে গণ্য করা হতো।

রাদা, ইব্ব ও হুদাইদাতে আল-কায়েদা হুথিদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করেছে এবং হুথিদের বহু নেতা ও ক্যাডারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে হুথিরা হুদাইদাতে আল-কায়েদার কিছু সেল ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের হামলায় বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন। সানায় হুথিদের উপর হামলাকারী স্লিপার সেলের বহু মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন এবং অনেকে বন্দি হয়েছেন।

হুথিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাইজে আল-কায়েদার বেশ কিছু ঘাটি ছিল। সেখানে মুজাহিদিনের হামলার টার্গেট ছিল সেইসব লোক যারা হুথিদের পক্ষে সৈন্য রিক্রুট করত। তাইজের বহু যুবক মুআজ মাশমাশার নাম জানে। হুথিদের জন্য সৈন্য রিক্রুটকারীদের উপর তিনি দীর্ঘদিন হামলা পরিচালনা করেছেন। হুথিরা তাইজ দখল করার পর তাদের সাথে এক লড়াইয়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

এডন, লাহিজ, শাবওয়াহ ও আবিয়ানে আল-কায়েদার ভাইয়েরা আহলে সুন্নাহর ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তবে আল-কায়েদাকে আবদুল লতিফ সায়্যিদের অনুগত কতিপয় আবিয়ানবাসীর সাথেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। আবদুল লতিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পালানোর পর আল-কায়েদা আবিয়ানবাসীর সহায়তায় মনোযোগ দেয়।

ইতিপূর্বে লোডারের অধিবাসীরা বায়দা অঞ্চলে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তবে হুথিদের অগ্রাভিযানে ভীত হয়ে কতিপয় লোডার জেলার অধিবাসী আল-কায়েদার কাছে অনুরোধ করে যেন তাদেরকে বায়দা ও লোডারের মধ্যবর্তী আকাবা সারায় টহল দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। পূর্বের সবকিছু ভুলে গিয়ে হুথিদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল-কায়েদা তাদেরকে আকাবা সারায় টহল দেওয়ার অনুমতি দেয়।

তাইজে প্রথম থেকেই আল-কায়েদা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আল-কায়েদার ভাইয়েরা যখন তাইজে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিল তখন তারা একটি পথকে নিরাপদ ভেবে সে পথে অগ্রসর হলো। তখন আল হারাক আল জুনুবীর যোদ্ধারা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে বন্দি করার চেষ্টা করে। এই ঘটনা যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি এবং তার এক সঙ্গী প্রায় শত্রুদের নাগালের মধ্যে ছিলেন। আল্লাহর রহমত না হলে হয়তো তারা গ্রেফতার এড়াতে পারতেন না।

আল-কায়েদার ভাইরা তাইজে যখন প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেন তখন তা হুথিদের হামলার শিকার হয়। এতে দুই ভাই শাহাদাতবরণ করেন এবং অপর কয়েকজন আহত হন।

সেখানে তারা ফজরুল ইসলাম নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন। এতে বিভিন্ন অপারেশনের সংবাদ থাকত।

আল-কায়েদার নিজস্ব মিডিয়া 'আল মালাহিম' ভাইদের বেশ কিছু অপারেশনের ভিডিও প্রচার করেন। আশাকরি সেগুলো পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে ইউটিউবে রয়েছে।

আসসিলো জেলায় প্রথম পর্যায়ে প্রবেশকারীদের সাথে আল-কায়েদার একটি দলও প্রবেশ করে। সেখানে তারা বেশ কিছু অপারেশন চালায়। শাইখ হাজামের উপর

তারাই হামলা চালায়। উক্ত 'শাইখ' ষড়যন্ত্র পাকাতে দারুন পটু। যারা সালেহের পক্ষে কাজ করত সে ছিল তাদের মুরুব্বী। ব্যাটালিয়ন ৩৫ এর নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে সে ছাড়া পায়।

বায়দা ও রাদায় এখনো পর্যন্ত আল-কায়েদার কয়েকটি ফ্রন্ট সক্রিয় রয়েছে। তারা আহলে সুন্নাহর বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাদের তৎপরতায় শরিক রয়েছে। আর আমেরিকা বরাবরের মতোই উভয় অঞ্চলে বিমান বাহিনীর মাধ্যমে হুথিদের সাহায্য করে যাচ্ছে।

১১. যে সকল ইসলামি দল ও উলামা-মাশায়েখ আল-কায়েদার আদর্শের সাথে একমত নয়, তাদের ব্যাপারে আল-কায়েদার অবস্থান কি?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর ডক্টর আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ এর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাক। বিশ্বব্যাপী আল-কায়েদার সকল শাখার প্রতি দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেন-

অপরাপর ইসলামি দলসমূহের ব্যাপারে আল-কায়েদার অবস্থান

১১. ইসলামি দলসমূহের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান-

- যেসব বিষয়ে আমরা একমত সেসব বিষয়ে সহযোগিতা বিনিময় করব। মতবিরোধের ক্ষেত্রে সদুপদেশ দিবো।
- ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াইকে অগ্রাধিকার দিবো। তাই কোনও ইসলামি দলের সাথে মতবিরোধের ফলে শত্রুদেরকে সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে পরাজিত করার নীতি থেকে সরে আসব না।
- তারা যখন সঠিক বলবেন তখন তাদেরকে আমরা সমর্থন করব এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আর তারা ভুলের শিকার হলে সদুপদেশ দেব; গোপন ভুলের ক্ষেত্রে গোপনে এবং প্রকাশ্য ভুলের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে। এক্ষেত্রে পূর্ণ ভাবগাম্ভির্যতা রক্ষা করব এবং ইলমী ভাষায় উপদেশ দেব। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হেয় করা

থেকে বিরত থাকব। কেননা ব্যক্তিগত আক্রমণের তুলনায় দলিল নির্ভর কথাই বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে।

১২. আল-কায়েদার কেউ যদি দল ত্যাগ করে তাহলে কি আল-কায়েদা তাকে হত্যা করে?

উত্তর : আল-কায়েদা একটি আদর্শভিত্তিক দল। এই আদর্শের মাধ্যমে আল-কায়েদা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। তাদের মুখ্য বিষয় হলো লক্ষ্যে পৌঁছা। তা আল-কায়েদার মাধ্যমে হোক চাই অন্য কোনও দলের মাধ্যমে। উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আল-কায়েদা মানুষকে তাদের দলে শামিল হতে উৎসাহিত করে। যারা উক্ত চেতনা ধারণ করে ও দলে শামিল হয় তাদের কারণে আল-কায়েদা আনন্দিত হয়। তারপর যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অথবা শিথিলতা প্রদর্শন করে সে নিজে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

তবে এজন্য সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না, বরং সে এমন একটি জামাআহ থেকে বেরিয়ে গেল যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। সুতরাং এখানে এমন কিছু নেই যার কারণে সে হত্যার উপযুক্ত হতে পারে।

এসব কল্পিত প্রশ্নের স্রষ্টা হল গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা। তারা বুঝতে পেরেছে, আল-কায়েদার সাথে তাদের লড়াই মূলত অস্তিত্বের লড়াই। এজন্যই তারা অবান্তর প্রশ্ন তুলে মুসলিম উম্মাহ ও আল-কায়েদার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায়। যাতে মানুষ আল-কায়েদার আহ্বানে সাড়া না দেয়।

আমি লক্ষ্য করেছি, যেসব এলাকায় আল-কায়েদার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের দৃশ্যমান কোনও তৎপরতা নেই। হয়তো আল-কায়েদা থাকবে, নয়তো গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন।

১৩. আল-কায়েদা কি তার মুজাহিদগণকে ইসতিশহাদী হামলা করতে বাধ্য করে?

উত্তর : আলেমগণের প্রণীত কঠোর নীতিমালার ভিত্তিতে আল-কায়েদা ইসতেশহাদী হামলাকে বৈধ মনে করে। তবে মাসআলাটি ইজতেহাদী। এখানে যে কারো মতবিরোধ থাকতে পারে। তাই আল-কায়েদা তার মুজাহিদগণকে ইসতেশহাদী

হামলা করতে বাধ্য করা তো দূরের কথা, এই হামলাকে জায়েজ বলে বিশ্বাস করতেও চাপ দেয় না।

১৪. তাইজে গুপ্তহত্যা ও লুটতরাজের জন্য কারা দায়ী? এর সাথে আল-কায়েদার কোনও সম্পর্ক ছিল কি?

উত্তর : আল-কায়েদা এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের এলোপাথাড়ি কাজে তারা কখনোই অগ্রসর হয় না। আল-কায়েদা একটি আদর্শভিত্তিক দল। তারা মানুষের কাছে নিজেদের দাওয়াহ ও বার্তা পৌঁছাতে চায়। কিতাল তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এটি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার শরয়ী মাধ্যম।

তেমনি যারা আল-কায়েদার দৃষ্টিতে কতলের উপযুক্ত তারা তাদের সকলকেই হত্যা করে না। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। একবারের ঘটনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি ইনসাফ করুন, কারণ আপনি ইনসাফ করেননি। এ ধরনের কথা রাসূল-অবমাননার শামিল এবং এটি কুফরি বাক্য। এর ফলে সে কতলের উপযুক্ত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দেন। কারণ তাকে হত্যা করা হলে মানুষের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারত। মানুষ বলাবলি করত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে।

সুতরাং হত্যার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যারা কখনো হত্যা করা থেকে বিরত থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ উত্থাপন করা কি যৌক্তিক হবে যে, কেবল দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে তারা হত্যা করে! তেমনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়াই কুফরি নয়, যদি না কুফরির পর্যায়ভুক্ত কোনও সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

একবার আমাকে অবহিত করা হলো যে, আমাদের কতিপয় ভাই হাসসাম বিগ্রেডের প্রধান আদনান জুরাইককে তাকফির করে, কারণ সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আমি তাদেরকে বললাম, শুধু সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া কুফরির কারণ নয়। কাফেরকে মুসলিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করা বা কাফেরকে কুফরি কাজে সাহায্য করাই মূল বিষয়। উক্ত কারণ কারো মধ্যে পাওয়া গেলে আমরা তার উপর কুফরির হুকুম আরোপ করব। আদনান জুরাইক হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এর মাধ্যমে সে

কাফেরকে মুসলিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করা বা কাফেরকে কুফরির উপর সাহায্য করার মতো কিছু করছে না। সুতরাং তাকে তাকফির করার যৌক্তিকতা ও বৈধতা কোথায়?

বস্তুত তাইজের লুটতরাজ ও গুপ্তহত্যার সাথে আল-কায়েদার কোনোই সম্পর্ক নেই। এসব আইএসের কাজ, অথবা এমন কারো কাজ যাকে বাড়াবাড়ির কারণে পূর্বেই আল-কায়েদা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এখানে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, আমরা তাইজে প্রবেশ করার পর সেখানকার পরিস্থিতি কঠোরভাবে বিবেচনায় রেখেছি। তাইজকে এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করেছি, যেসবের কারণে মার্কিনীরা তাদের সন্ত্রাসবাদ তত্ত্বের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। তাইজে প্রবেশকালে আল-কায়েদার আমীরের উপস্থিতিতে প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের উঁচু পর্যায়ের একজন কমান্ডারকে বলেছিলাম, আমরা আপনাদের কোনও ক্ষতি করব না। আপনাদের মনকষ্টের দিকে লক্ষ্য করে আমরা আমাদের পতাকাও উত্তোলন করব না। আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলাম। আমাদের অধিকৃত অঞ্চল ও গাড়িতে পর্যন্ত আমরা আল-কায়েদার পতাকা উত্তোলন করিনি।

তাইজে আহলে সুন্নাহর উপর হুথিদের হামলা প্রতিহত করা ছিল আমাদের অগ্রাধিকার। হামাসের অধিবাসী অনেক ভাই তাইজে সামাজিক কিছু পাপাচার প্রতিরোধ করার প্রতি মনোযোগ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ আপাতত এধরণের কাজে জড়াতে নিষেধ করলেন। কেননা তুলনামূলক বড় সমস্যা থেকে তাইজকে মুক্ত করাই ছিল ফিকহুল মুয়াজানাতের দাবী।

তেমনি গনিমতের মাল বন্টন নিয়ে যখন সীমালঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলো তখন আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ তা বন্টন করতে নিষেধ করলেন এবং এ ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন, এমনকি কিছু সদস্যকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করা হয়।

প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের কয়েকটি গ্রুপ যখন হায়েল সাঈদ পরিবারের বিপুল সম্পদ হাতিয়ে নিতে শুরু করে এবং সন্দেহের তর্জনী তাক করা হয় আল-কায়েদার দিকে, তখন আল-কায়েদা এ বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে যে, আমাদের সাথে এই ঘটনার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, মুসলিমদের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া আল-কায়েদা বৈধ মনে করে না।

এসব দখলদারিত্ব ও অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে আল-কায়েদা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অপরাপর দলসমূহের সাথে মিলে একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দুজন ঊর্ধ্বতন নেতা মুমিন মিখলাফী এবং আম্মার জুনদুবী আল-কায়েদার উক্ত মহৎ প্রচেষ্টার কথা এখনো স্মরণ করেন।

তাইজে প্রবেশকালে আমরা সংকল্প করেছিলাম যে, আহলে সুন্নাহর ভাইদের জন্য ভালো কিছু করব। এজন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। সকল গোত্রের সাথে আমরা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করেছি। যারা আমাদেরকে কাছ থেকে দেখেছেন তারা ভালো করেই জানেন যে, তাইজের অরাজকতার সঙ্গে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আহলে সুন্নাহর ভাইদের জানা থাকা উচিৎ- আইএস তাইজে যেসব অপকর্ম করেছে তা তারা একা করেনি। বরং তাদের সাথে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কয়েকটি দল ও তাদের কিছু নেতৃবর্গও ছিল। এখানে তাদের নাম উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমার ভালোই জানা আছে। যাইহোক, এসব নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল জিহাদের নামে অপকর্ম করে জিহাদের ব্যাপারে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করা। এসব নেতাদের পেছনে ছিল সেইসব রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, যারা তাইজ ও তাইজবাসীর মঙ্গল চায় না, বরং তাইজকে অকৃতকার্য ভূখণ্ড হিসেবে দেখতে চায়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব এখানেই শেষ।

জিহাদের সাধারণ দিক-নির্দেশনা

আল-কায়েদার সকল শাখার প্রতি ডক্টর আইমান আজ যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ এর দেওয়া দিকনির্দেশনার মাধ্যমে আলোচনা শেষ করব।

১. সর্বসাধারণকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নবীন মুজাহিদগণকে বিশুদ্ধ আকিদায় বিশ্বাসী, সুশৃঙ্খল, একাগ্র ও ঐক্যবদ্ধশক্তি রূপে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা। তাদেরকে হতে হবে ইসলামি আকিদা ও ইসলামি শরিয়ার অনুসারী। মুমিনদের সামনে তারা হবে দয়াশীল ও নম্র।

কাফেরদের সামনে তারা হবে ইস্পাত কঠিন। জিহাদি দলসমূহ থেকে ইলমী ও দাওয়াতী কার্যক্রমের জন্য মেধাবীদেরকে খুঁজে বের করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. কুফরিবিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও জনবলের দিক থেকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করতে সামরিক কার্যক্রমের উপর জোড় দেওয়া। ইনশাআল্লাহ অচিরেই তারা পিছু হটতে বাধ্য হবে। প্রত্যেক মুজাহিদের জানা থাকা উচিৎ যে, বিশ্বের যে কোনও স্থানে ইহুদি-খৃস্টান জোটের স্বার্থে আঘাত হানা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তারা যেন এজন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালায়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও একটি বিষয় হচ্ছে, মুসলিম বন্দীদেরকে উদ্ধার করতে চেষ্টা চালানো। যেমন, জেলখানায় হামলা করা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্য থেকে পনবন্দী করার চেষ্টা করা। যাতে বন্দী-বিনিময় সম্ভব হয়।

কুফরি বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রের বিষয়ে গুরুত্বারোপের অর্থ এই নয় যে, জালিমদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলো যুদ্ধ করতে পারবে না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার কাউকাজের রয়েছে; হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার কাশ্মীরী ভাইদের রয়েছে; চায়নাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার পূর্ব তুর্কিস্তানের রয়েছে। তেমনি বার্মা, ফিলিপাইনসহ বিশ্বের নির্যাতিত প্রত্যেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে জুলুমকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার।

৩. পারতপক্ষে স্থানীয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়ানো। তবে বাধ্য করা হলে ভিন্ন কথা। ব্যতিক্রম হবে সেসকল ক্ষেত্রে - যেখানে স্থানীয় সরকার মার্কিন শক্তির অংশবিশেষে পরিণত হয়, যেমনটি ঘটেছে আফগান সরকারের বেলায়। অথবা যদি স্থানীয় সরকার আমেরিকার হয়ে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যেমনটি ঘটেছে সোমালিয়া ও জাজিরাতুল আরবে। অথবা যদি স্থানীয় সরকার কোনোভাবেই মুজাহিদগণকে বরদাশত না করে অর্থাৎ জিরো-টলারেন্স হয় যেমনটি দেখা যায় শাম, ইরাক ও মরক্কোয়।

মূলত স্থানীয় শত্রুর সাথে লড়াইয়ে না জড়ানোই আমাদের নীতি। তবে লড়াই ছাড়া যদি কোনও উপায় না থাকে তাহলে জনগণকে অবগত করতে হবে যে, আমাদের এই লড়াই প্রকৃত বিচারে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরই অংশ।

অতঃপর যখনই এই সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হবে তখন সেই সুযোগকে লুফে নিতে হবে এবং মানুষের মাঝে দাওয়াহর প্রসার ঘটাতে হবে। জিহাদের জন্য

তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যোদ্ধা ও সাদাকাত সংগ্রহ করতে হবে, কারণ আমাদের জিহাদ দীর্ঘ মেয়াদী। জনবল, অর্থবল ও সক্ষমতা অর্জন ছাড়া তা দীর্ঘ সময় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

খৃস্টানদের পক্ষ হয়ে যে সকল স্থানীয় সরকার মুজাহিদদের উপর হামলার ধৃষ্টতা দেখায় তাদেরকে এতটুকু শায়েস্তা করা দোষের কিছু নেয়, যতটুকুতে তারা টের পাবে যে, আমাদেরকে টার্গেট করার ফল শুভ নয়। প্রতিটি ক্রিয়ারই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং অবশ্যই রয়েছে উপযুক্ত সময়। মুজাহিদগণের প্রতিটি ফ্রন্টের জন্যই এ নীতি প্রযোজ্য। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

৪. রাফেজী, ইসমাইলী, কাদিয়ানী, ভণ্ড পীর-ফকিরসহ বাতিল ফিরকাগুলোর সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত না হওয়া, তবে তারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তবে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে যারা আমাদের উপর হামলা করবে আমরা কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করব। তাদের পরিবার-পরিজনের উপর, তাদের বাসগৃহে হামলা করা থেকে বিরত থাকা। তাদের উপাসনালয়, উৎসবস্থল এবং তাদের ধর্মীয় জামায়েতের উপর হামলা করা যাবে না। তবে তাদের বিকৃত ও ভ্রান্ত আকিদাসমূহের অসারতা প্রমাণের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

মুজাহিদগণের অধিকৃত অঞ্চলে বাতিল ফিরকাগুলোর সাথে হিকমতপূর্ণ আচরণ করা। দাওয়াহ, সংশয় নিরসন ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালু রাখা। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেন ছোট মুনকারের প্রতিরোধ বড় মুনকারের কারণ না হয়। যেমন, মুজাহিদগণ অধিকৃত অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া, গণ- অসন্তোষ দেখা দেওয়া, অথবা এমন কোনও ফিতনা ছড়িয়ে পড়া, যাকে শত্রুরা উক্ত অঞ্চলের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

৫. ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত খৃস্টান, শিখ ও হিন্দুদের পেছনে লেগে না থাকা। তবে তারা যদি কোনও বাড়াবাড়ি করে তাহলে তাদেরকে জবাব দেওয়া এবং জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা। আর মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে, সংঘাতের সূচনা আমরা করিনি। আমরা তাদেরকে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চাই। আমরা তো কেবল কুফরি শক্তির নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

৬. আমাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেনি আমরা তাদের সাথে লড়াই থেকে বিরত থাকব। মৌলিকভাবে আমরা লড়াই করব খ্রিষ্টান-জোটের সাথে এবং তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত স্থানীয়দের সাথে।

৭. যে সকল গোত্র আমাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করবে যদি সেই গোত্রে এমন কেউ থাকে যে যুদ্ধ করে না, তাহলে আমরা তাকে টার্গেট করব না।

৮. বিস্ফোরণ, হত্যা, অপহরণ, সম্পদের ক্ষতিসাধন ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

৯. মসজিদে, বাজারে বা গণজমায়েতে মিশে থাকা শত্রুর উপর হামলা করব না। তেমনি যেসব লোক আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, যদি শত্রু তাদের মাঝে থাকে তাহলে তার উপর হামলা করব না।

১০. উলামায়ে কেরামকে সম্মান করব, তাদেরকে আগলে রাখব। তারা নবীগণের ওয়ারিশ ও উম্মাহর পথপ্রদর্শক। আলেমদের মধ্য থেকে যারা প্রকাশ্যে হক কথা বলছেন এবং এজন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন তাদের ক্ষেত্রে একথা আরও জোরালোভাবে প্রযোজ্য। আর উলামায়ে সু'র বিরুদ্ধে আমাদের তৎপরতা তাদের ছড়ানো সংশয় নিরসনের মাঝে সীমাবদ্ধ করবো। তবে যদি তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধ লড়াইয়ে নামে তাহলে ভিন্ন কথা।

১১. ইসলামি দলসমূহের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান-

- যেসব বিষয়ে আমরা একমত সেসব বিষয়ে সহযোগিতা বিনিময় করব। মতবিরোধের ক্ষেত্রে সদুপদেশ দিবো।

- ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াইকে অগ্রাধিকার দিবো। তাই কোনও ইসলামি দলের সাথে মতবিরোধের ফলে শত্রুদেরকে সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে পরাজিত করার নীতি থেকে সরে আসব না।

- তারা যখন সঠিক বলবেন তখন তাদেরকে আমরা সমর্থন করব এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আর তারা ভুলের শিকার হলে সদুপদেশ দেব; গোপন ভুলের ক্ষেত্রে গোপনে এবং প্রকাশ্য ভুলের ক্ষেত্রে

প্রকাশ্যে। এক্ষেত্রে পূর্ণ ভাবগাম্ভির্যতা রক্ষা করব এবং ইলমী ভাষায় উপদেশ দেব। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হেয় করা থেকে বিরত থাকব।

- ইসলাম নামধারী কোনও দল যদি শত্রুদের ফাঁদে পা দেয় এবং তাদের পক্ষে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে ততটুকুই জবাব দেব যতটুকু না দিলেই নয়। এর মাধ্যমে ফিতনার দরজা বন্ধ হবে এবং যারা এখনো শত্রুদের সাথে হাত মেলায়নি তারা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

১২. জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের বিদ্রোহের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান-

- মাজলুমদের বিদ্রোহকে সমর্থন করা, কারণ মাজলুমকে সাহায্য করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব।

- অংশগ্রহণ, কারণ মজলুমের বিদ্রোহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার শরিয়তের দৃষ্টিতে ফরজ।

- দিকনির্দেশনা দান, বিদ্রোহীদেরকে এই কথা জানানো যে, কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শরিয়াহর অনুশাসন মেনে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামি নেযাম ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

১৩. যে কেউ অধিকার বঞ্চিত মুসলিমদের পক্ষাবলম্বন করবে এবং কথা বা কাজের মাধ্যমে জালেমদের বিরোধিতা করবে তাকে সমর্থন করা এবং সাহস যোগানো। যতদিন তাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ততদিন আমরা তাদের উপর আক্রমণ করবো না এবং তাদের সমালোচনা করবো না।

১৪. মুসলিমদের হক সংরক্ষণ করা। তাদের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা।

১৫. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যারা মাজলুমের পাশে দাঁড়ায় তারা অমুসলিম হলেও তাদের সমর্থন করা এবং সাহায্য করা।

১৬. মুজাহিদগণের উপর কোনও অপবাদ আরোপ বা মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হলে গুরুত্বের সাথে তা খণ্ডন করা। যদি জানা যায় যে, মুজাহিদগণের কারো মাধ্যমে

অন্যায় কিছু সংঘটিত হয়েছে, তাহলে ইসতিগফার করা এবং অপরাধীর অপরাধ থেকে বারাআত (সম্পর্কহীনতা) ঘোষণা করা।

১৭. আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ, আল-কায়েদার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সমমনা প্রতিটি দলের আমীরগণের কাছে অনুরোধ করব, যেন তারা উক্ত দিকনির্দেশনাসমূহ নিজেদের দায়িত্বশীল ও সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। জিহাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে শরিয়ার আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব কর্মনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশাকরি, আল্লাহর মেহেরবানীতে এগুলো কল্যাণকর হবে এবং অকল্যাণ ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

والحمد لله رب العلمين وصلى الله على نبينا محمدو اله وصحبه وسلم

*****